বিভিন্ন ফের্কা, ধর্ম ও মতবাদের মূলনীতি

[বাংলা– Bengali – بنغالي]

ড. সফর ইবনে আব্দুর রহমান আল-হাওয়ালি

অনুবাদ : সানাউল্লাহ নজির আহমদ

সম্পাদনা : ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

2015-1436

IslamHouse.com

﴿أصول الفرق والأديان والمذاهب الفكرية﴾

« باللغة البنغالية »

الشيخ الدكتور سفر بن عبد الرحمن الحوالي

ترجمة: ثناء الله نذير أحمد

مراجعة:د/ أبو بكر محمد زكريا

2015 - 1436

IslamHouse.com

ভূমিকা

সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য, সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক সে সত্তার উপর যার পর কোনো নবী নেই, অতঃপর,

আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণ করেছেন মানুষ তখন ছিল ঘোর অন্ধকার ও চরম মূর্খতায়। পাথর, গাছ, জিন, মালায়েকা, তারকা, গণক, বাদশাহ, শয়তান, পাদরি ও বৈরাগীদের তারা ইবাদত করত। অথচ জ্ঞানী, কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক, ইবাদতগুজার ও বাগ্‌বিদগ্ধ অনেক বক্তা তাদের মাঝে উপস্থিত ছিল, কেউ তাদের কোনো কাজে আসেনি, কেউ বের করেনি তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোয়।

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে নূর নিয়ে আগমন করেন, তখন বিশ্ববাসীর নিকট হিদায়েত ও সত্যের সূর্য উদয় হয়। পুরো দুনিয়া আলোকিত হয় কি মুসলিম কি কাফির। পরিপক্ক বিবেক ও সুস্থ স্বভাবের অধিকারী যার নিকট এ দীন পৌঁছেছে সে অবশ্যই তার উপর ঈমান এনেছে এবং বিশ্বাস করেছে এটাই সত্য।

আল্লাহ তা'আলা সম্পূর্ণ সত্য ও পরিপূর্ণ হিদায়েত নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ওহি করেন। তিনি স্বীয় রবের বাণী পৌঁছে দেন পুঙ্খানুপুঙ্খ যা তার নিকট ওহি করা হয়। একটি হরফও

তিনি গোপন করেননি। সাহাবিগণ তার থেকে তা গ্রহণ করেন, তাদের সবার উপর আল্লাহর সন্তুষ্টি, তারাই মানুষের মাঝে সত্যের প্রতি বেশি আগ্রহী ও হিদায়েতের অধিক অনুসারী ছিল। অধিকন্তু বুঝের শক্তি ও পরিচ্ছন্ন মেধার মাধ্যমে আল্লাহ তাদেরকে যে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন তা তো আছেই।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আমানত পৌঁছে দেন, রিসালাত আদায় করেন, আল্লাহও স্বীয় দীনকে পূর্ণ করেন, তিনি তাকে নিজের কাছে উঠিয়ে নেন। তার পশ্চাতে সাহাবিগণ অকাট্য দলিল ও সোজা পথের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকেন, দীনের মৌলিক নীতিতে কখনো তারা বিরোধ করেননি। তাদের মাঝে আল্লাহর দীনে বিদ‘আত সৃষ্টিকারী কেউ ছিল না, ছিল না কোনো কাদরি, খারেজি, অপব্যাখ্যাকারী ও মুয়াত্তিল... না অন্য কেউ। তবে কতক শাখা মাসআলা ও বিধি-বিধানে তাদের মাঝে মতপার্থক্যও সংঘটিত হয়েছিল।

এভাবেই নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবি ও তাদের সাথীরা একদল ও কিতাব-সুন্নার উপর একতাবদ্ধ ছিল। এ জন্যই তাদের নামকরণ করা হয় ‘জামা‘আত’।

এ হালতে ছিল মুসলিম উম্মাহ, যতক্ষণ না উসমান রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু ও তার পরবর্তী যুগে ফেতনার সূচনা ও মুসলিমদের মাঝে

যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যারা ফেতনার জন্ম দেয় ও বিভিন্ন দল সৃষ্টি করে তারা দুই শ্রেণির:

প্রথম শ্রেণি: ধ্বংসকারী হিংসুক, তারা কুফর গোপন ও ইসলাম প্রকাশ করে।

দ্বিতীয় শ্রেণি: প্রবৃত্তির অনুসারী, তারা স্বীয় প্রবৃত্তির অনুসরণ ও জামা'আতের বিরোধিতা করে।

কতিপয় মূর্খ, দীনে সদ্য প্রবেশকারী ও প্রতারিত কতক সাধারণ লোক এ দুই দলের অনুসরণ করে, তখন থেকে বিভিন্ন দল আত্মপ্রকাশ করে নানা রূপ ও বৈশিষ্ট্যে।

বিভিন্ন ফেরকার মূলনীতি

এবং তাদের সাথে আহলে-সুন্নাহ ওয়াল-জামা'আতের আচরণ বিধি

১. খাওয়ারিজ[1]: তারাই সর্বপ্রথম সুন্নাহ ও জামা'আত থেকে বের হয়, সাহাবিগণ তাদের সাথে বিতর্ক ও তাদের মতামতের বিরুদ্ধে দলিল-প্রমাণাদি পেশ করেন, ফলে তাদের কতক তওবা করে, যারা তওবা করে নি তাদের সাথে সাহাবীগণ যুদ্ধও করেন এবং তাদের হাজারো লোককে হত্যাও করেন।

২. খারেজি ফেরকা আত্মপ্রকাশ করতে না করতে শিয়াদের আত্মপ্রকাশ ঘটে, তবে চরমপন্থি শিয়া ফেরকার প্রতিষ্ঠাতা আব্দুল্লাহ ইবনে সাবা ইয়াহূদী ফেতনার মূল ও ইসলাম ধ্বংসকারী হিংসুকদের নেতৃত্বে ছিল পূর্ব থেকেই।

সাহাবিগণ—আল্লাহর সন্তুষ্টি তাদের উপর—শিয়াদের বাড়াবাড়ি-সীমালঙ্ঘন অনুসারে তাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত প্রদান করেন। তাদের কেউ ছিল যার ব্যাপারে সাহাবিগণ আগুনে পোড়ানো ও নির্বাসনে পাঠানোর সিদ্ধান্তও দিয়েছিলেন।[2]

---

[1] একবচন 'খারেজি' বহুবচন 'খাওয়ারিজ' আভিধানিক অর্থ বহিস্থ। এখানে উদ্দেশ্য সাহাবি বা মুসলিমদের জামাত থেকে বহিস্থ দল। অনুবাদক।

[2] এ সম্পর্কে সামনে বিস্তারিত আলোচনা আসছে।

৩. সাহাবিদের শেষ যুগে ‘কাদরি’ (তথা তাকদীর অস্বীকারকারী) ফেরকার আবির্ভাব ঘটে।

সাহাবিগণ কঠোরভাবে তাদের প্রতিবাদ করেন। তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন, উম্মতকে তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা, তাদেরকে সালাম না দেওয়া অথবা তাদের মৃতদের উপর জানাযা না পড়া, অথবা তাদের রোগীদের দেখতে না যাওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন।

কাদরি বিদ‘আতের এক প্রতিষ্ঠাতা গায়লান দামেস্কি কয়েকজন তাবে‘ঈর ফতোয়ার কারণে উমাইয়া খলিফা হিশাম ইবনে আব্দুল মালিকের হাতে স্বীয় ধ্বংসকে আলিঙ্গন করে।

৪. সাহাবিদের যুগ শেষে জা‘দ ইবনে দিরহাম ও তার ছাত্র জাহাম ইবনে সাফওয়ানের হাতে আল্লাহর সিফাৎ তথা গুণাবলী অস্বীকার করার বিদ‘আত আত্মপ্রকাশ করে। তার সাথে সম্পৃক্ত করেই আল্লাহর সিফাত অস্বীকারকারীদের ‘জাহমিয়া’ বলা হয়।

মুসলিম উম্মাহ এ বিদ‘আতকেও কঠিনভাবে প্রতিরোধ করেন, ফলে জা‘দ ও জাহাম উভয় তাদের নাস্তিকতার পরিণতি হিসেবে ধ্বংসকে আলিঙ্গন করে।

৫. একই সময়ে ওয়াসেল ইবনে ‘আতা ও ‘আমর ইবনে ‘উবাইদের তত্ত্বাবধানে ‘মু‘তাযিলা’ ফেরকার জন্ম হয়। তারা উভয়ে বিশিষ্ট তাবে‘ঈ হাসান বসরির হালাকার (দারসের) ছাত্র ছিল। প্রথমে ঈমান

সংক্রান্ত বিষয়ে তাদের বিদ‘আত সীমাবদ্ধ ছিল। অতঃপর তার সাথে তারা তাকদীর ও আল্লাহর সিফাৎ অস্বীকার করার বিদ‘আত যুক্ত করে।[1]

হাসান বসরি রহ. ওয়াসেল ও আমর উভয়কে স্বীয় হালাকা থেকে তাড়িয়ে দেন। উম্মতের সকল আলেম মু‘তাযিলাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন ও তাদের পরিত্যাগ করার ফতোয়া দেন, তাদের পূর্বপুরুষ ‘কাদারি’ ফেরকার সাথে সাহাবিরা যেরূপ করেছেন তারাও সাহাবিদের অনুসরণ করে মু‘তাযিলাদের সাথে আচরণের ক্ষেত্রে অনুরূপ পন্থা অনুসরণ করে।

৬. খারেজি ও মু‘তাযিলা ফেরকার বিপরীতে ‘মুরজিয়া’ ফেরকার জন্ম হয়। তাদের কেউ ছিল চরমপন্থি, এরা মূলত জাহমিয়া। আহলে-সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আত ফতোয়া দেন যে তারা কাফের ও দীন থেকে বহিস্থ। আর যারা চরমপন্থি নয়, তাদের ব্যাপারে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের মত হচ্ছে যে এরা গোমরাহ ও বিচ্ছিন্নতাবাদী। অতঃপর আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আত তাদের সাথে সেই আচরণ করেন ইতোপূর্বে কাদরিয়া ফেরকার সাথে যে আচরণ করেছেন।

[1] সামনে মু‘তাযিলা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আসছে।

সারকথা:

ক. এভাবে মৌলিক ফেরকাসমূহ আত্মপ্রকাশ করে, অর্থাৎ ‘খারেজি, শিয়া, মুরজিয়া, কাদারিয়া ও জাহমিয়া।

আমরা মু‘তাযিলা ফেরকা উল্লেখ করিনি; কারণ তাদের মাযহাব এসব নীতির সমন্বয়ে গঠিত। দ্বিতীয়ত ‘কাদরিয়া’ নামটি বিশেষ অর্থে তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়।

এসব মৌলিক ফেরকাসমূহ থেকে অনেক ফেরকা সৃষ্টি হয়। আল্লাহর ইচ্ছায় গুরুত্বপূর্ণ এসব ফেরকা ও তার থেকে সৃষ্ট কতক শাখা সম্পর্কে আমরা আলোচনা করব।

খ. আমাদের সামনে স্পষ্ট হল যে, বিদ‘আতিদের ক্ষেত্রে আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আতের অবস্থান পরিষ্কার। এ অবস্থান আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আতের আদর্শের মূলনীতির অন্তর্ভুক্ত।

এ অবস্থানই ধরে রেখেছিল উম্মত, ফলে বিদ‘আতিরা কখনো হত্যা, কখনো লাঞ্ছনার স্বীকার হয়, এ অবস্থাই চলে আসছিল খলীফা মামুন ইবনে হারুনুর রশিদের যুগ পর্যন্ত, যিনি ১৯৮-২১৮হি. মেয়াদে খিলাফতের দায়িত্বে ছিলেন।

তার যুগে বিদ‘আত ও বিদ‘আতিদের অবস্থা দৃঢ় হয় এবং সেই দরজার দু’কপাট খুলে দেয় দর্শন ও তর্কশাস্ত্রের জন্য, যার আলোচনা ইলমে কালাম বা তর্ক শাস্ত্র শিরোনামে আসছে।

দীনের মাঝে এ বিভক্তি সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সংবাদ দিয়েছেন। তিনি—কল্যাণকামী ও আমানতদার হিসেবে—বলেছেন কিভাবে আমরা তা থেকে ও তার অনুসারীদের জন্য যে শাস্তির কথা এসেছে তা থেকে নাজাত পাবো।

বিশুদ্ধ সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত, তিনি বলেছেন:

«افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة، كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة، كلها في النار إلا واحدة، وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة، كلها في النار إلا واحدة، قالوا: يارسول الله، من تلك الفرقة الناجية؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي رواية قال: هي الجماعة»

“ইয়াহূদীরা একাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছে, প্রত্যেক ফেরকা জাহান্নামী একটি ব্যতীত। খৃষ্টানরা বাহাত্তর ফেরকায় বিভক্ত হয়েছে, প্রত্যেক ফেরকা জাহান্নামী একটি ব্যতীত। আর এ উম্মত অতিসত্বর তিয়াত্তর ফেরকায় ভাগ হবে, প্রত্যেক ফেরকা জাহান্নামী একটি ব্যতীত। তারা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, নাজাতপ্রাপ্ত দল কোনটি? তিন বললেন: আজকে আমি ও আমার সাহাবিগণ যার উপর রয়েছে তার উপর যে

থাকবে সে নাজাতপ্রাপ্ত"। অপর বর্ণনায় তিনি বলেছেন: "সেটা হচ্ছে আল-জামা'আত"।[1]

এ থেকে একদিকে যেমন জরূরী হচ্ছে বিভক্তির কারণ ও তার আলামত জানা, অপরদিকে তেমনি জরূরী হচ্ছে নাজাতপ্রাপ্ত দলের আলামত ও তার বৈশিষ্ট্য জানা।

---

[1] আহমদ: (২/৩৩২), আবুদাউদ: (৪৫৯৬), নাসিরুদ্দিন আলবানি রচিত: 'সিলসিলা সহিহা: (২০৩) ও (২০৪)

বিভক্তির কারণ ও তার আলামত

প্রথমত: কুরআন ও সুন্নাহর দিকে প্রত্যাবর্তন না করা এবং তা ব্যতীত অপর উৎস থেকে গ্রহণ করা:

দীন ও আকিদার সাথে সম্পৃক্ত সকল বিষয়ে সত্যের একমাত্র উৎস কুরআন ও সুন্নাহ। সাহাবি ও আদর্শ পূর্বপুরুষগণ যেভাবে বুঝেছেন সেভাবেই তা গ্রহণ করা। অতএব কুরআন ও সুন্নাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করা এবং তা বিশুদ্ধভাবে বুঝা সত্যের পথ ও মুক্তির পদ্ধতি। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَٰطِي مُسۡتَقِيمٗا فَٱتَّبِعُوهُۖ وَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمۡ عَن سَبِيلِهِۦۚ ذَٰلِكُمۡ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ١٥٣ ﴾ [الانعام: ١٥٣]

"আর এটি তো আমার সোজা পথ। সুতরাং তোমরা তার অনুসরণ কর এবং অন্যান্য পথ অনুসরণ করো না, তাহলে তা তোমাদেরকে তার পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। এগুলো তিনি তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর"।[1] তিনি আরো বলেন:

﴿ وَمَآ أَنزَلۡنَا عَلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي ٱخۡتَلَفُواْ فِيهِ وَهُدٗى وَرَحۡمَةٗ لِّقَوۡمٖ يُؤۡمِنُونَ ٦٤ ﴾ [النحل: ٦٤]

---

[1] সূরা আল-আনফাল: (১৫৩)

“আমি তোমার প্রতি কেবল এজন্যই কিতাব নাযিল করেছি, যাতে তুমি তাদের কাছে পরিষ্কার বর্ণনা করে দাও, যে বিষয়ে তারা বিতর্ক করছে এবং (এটি) হিদায়েত ও রহমত সেই কওমের জন্য যারা ঈমান আনে”।[1]

একমাত্র ওহি তথা কুরআন ও হাদিস নির্ভুল ও সংরক্ষিত উৎস, যে তা আঁকড়ে ধরবে সে কখনও পথহারা হবে না এবং দুনিয়া ও আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে না।

ফেরকাগুলো তখনই গোমরাহ হয়েছে আর উম্মত তখনই বিভক্ত হয়েছে, যখন সে গায়রে ওহীকে উৎস হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং তাতে অভ্রান্তি ও বিশুদ্ধতার আকিদা পোষণ করেছে, যেমন:

ক. **মুতাকাল্লিমগণ**—উদাহরণত মু‘তাযিলা ও আশ‘আরি সম্প্রদায়, তারা দর্শন শাস্ত্রের দিকে প্রত্যাবর্তন করেছে, আর —তাদের ধারণায়— বিচারক হিসেবে স্থির করেছে বিবেককে। তারা বলে: আমরা কিতাব ও মুতাওয়াতির (অকাট্যভাবে প্রমাণিত) সুন্নাহকে বিবেকী দলিলের উপর পেশ করবো, যদি তাকে সমর্থন করে ভালো, অন্যথায় নস তথা কুরআন ও হাদিসের তা‘ওয়ীল তথা প্রকাশ্য ব্যাখার ভিন্ন ব্যাখ্যা করা আবশ্যক হবে এবং তার অর্থকে অন্য অর্থের দিকে নিতে হবে, যদিও যেসব অর্থ তারা গ্রহণ করেছে তা

[1] সূরা নাহাল: (৬৪)

অতি দূরবর্তী ও কৃত্রিমতাপূর্ণ, যা আল্লাহ ও তার রাসূল উদ্দেশ্য করেন নি।

আকিদার ক্ষেত্রে গায়রে মুতাওয়াতির (যেসব হাদীস বহু বর্ণনা দ্বারা সাব্যস্ত নয়, সেগুলো ব্যতীত অন্য) সুন্নাহকে তারা দলিল গ্রহণ করে না, তার বিশুদ্ধতা যাই হোক না কেন।

আর এ জন্যই তাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা ধাবিত হয় দর্শন ও মানতেক (অর্থাৎ তর্ক শাস্ত্র ও যুক্তি বিদ্যার) কিতাবসমূহের অনুবাদ ও অধ্যবসায় এবং সেগুলোর পক্ষে বা বিপক্ষে অবস্থান নিয়ে তাতে মগ্ন থাকায়।

খ. **সূফীরা**; যারা বিচারক নির্ধারণ করেছে তাদের কাশফ, অথবা বিশেষ অবস্থা অথবা বিশেষ রুচিকে। দীনকে তারা হাকিকত ও শরীয়ত দু'ভাগে ভাগ করে।

শরীয়ত: শরীয়ত হচ্ছে কুরআন ও হাদিসে বর্ণিত বিষয় এবং আদর্শ পূর্বপুরুষ ও ফকিহদের বাণী। এটাকে তারা বলে: 'ইলমে যাহের'।

হাকিকত: হাকিকত হচ্ছে ইলহাম, আধ্যাত্মিক সাধনা ও স্বপ্নে হাসিল করা জ্ঞান। এটাকে তারা বলে: 'বাতেনি ইলম' অথবা 'ইলমে লাদুন্নি'। আবার তারা ইলমে যাহিরকে 'ইলমুল ওরাক' বা গ্রন্থগত বিদ্যা ও ইলমে বাতেনকে 'ইলমুল খিরাক' বা পাগড়ির ইলম বলে। তাদের কতক ইমাম থেকে বর্ণিত:

(تأخذون-يعني: علماء السنة- علمكم ميتا عن ميت، فتقولون: حدثنا فلان عن فلان... ونحن نأخذ علمنا عن الحي الذي لا يموت، فنقول: حدثني قلبي عن ربي)!!

“তোমরা—মুহাদ্দিসগণ—তোমাদের ইলম মৃত থেকে মৃত গ্রহণ কর, তাই তোমরা বল: অমুক আমাদেরকে বলেছে অমুক থেকে। আর আমরা আমাদের ইলম গ্রহণ করি জীবিত সত্তা থেকে যিনি মৃত্যুবরণ করবেন না, তাই আমরা বলি: আমার অন্তর বলেছে আমার রবের পক্ষ থেকে”।

এ উৎসের প্রতি বিশ্বাসের কারণে সূফীরা ইলম অন্বেষণের জন্য সফর করত না, অথবা হাদিস ও ফিকহের কিতাবের প্রতি গুরুত্বারোপ করত না, বরং তারা সফর করত নির্জনতা, মঠ ও খানকায়, সাক্ষাত করত খৃস্টান, বৌদ্ধ ও অন্যান্য ধর্মের বৈরাগীদের সাথে। যাদের নিকট তারা জ্ঞানের রহস্য ও বিভিন্ন হালত সম্পর্কে জানতে চায়। তারা আরো ব্যস্ত হয় বিশেষ অবস্থা তথা আবেগ আপ্লুতা সৃষ্টি ও মনের ব্যাকুলতা তৈরী করার জন্য কবিতা ও গান শুনতে। আর ত্যাগ করে কুরআনুল কারিম শ্রবণ ও তার তিলাওয়াত।

গ. শিয়া বাতেনিরা অভ্রান্ত উৎস বানিয়েছে তাদের ইমামদের বাণীকে, এ জন্য তাদের ধর্মের মূলনীতি হচ্ছে: ইমামগণ মৌলিক ও আনুষঙ্গিক বিষয়ে নির্ভুল। তাদের বিদ্যান ও সংস্কারকরা তো কেবল তাদের তথাকথিত (অদৃশ্য) ইমামের প্রতিনিধি ও পর্দাস্বরূপ।

এ জন্য তারা প্রমাণিত নির্দিষ্ট উৎস—কুরআন ও সুন্নাহ—ত্যাগ করে আঁকড়ে ধরেছে কল্পনাপ্রসূত, বরং অস্তিত্বহীন উৎসকে, তথা তথাকথিত পাহাড়ের গর্তে অন্তরীণ অদৃশ্য ইমাম ও তার মত অদ্ভুত বস্তুকে।

দ্বিতীয়ত: দীনের কতক অংশ গ্রহণ করা ও কতক অংশ ত্যাগ করা:

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّا نَصَٰرَىٰٓ أَخَذۡنَا مِيثَٰقَهُمۡ فَنَسُواْ حَظّٗا مِّمَّا ذُكِّرُواْ بِهِۦ فَأَغۡرَيۡنَا بَيۡنَهُمُ ٱلۡعَدَاوَةَ وَٱلۡبَغۡضَآءَ إِلَىٰ يَوۡمِ ٱلۡقِيَٰمَةِۚ ١٤ ﴾ [المائدة: ١٤]

“আর যারা বলে, আমরা নাসারা, আমি তাদের থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম। অতঃপর তাদেরকে যে উপদেশ দেওয়া হয়েছিল, তার একটি অংশ ভুলে গিয়েছে, ফলে আমি তাদের মাঝে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত শত্রুতা ও ঘৃণা উসকে দিয়েছি”।[1]

কেননা, দীন শামিল ও পরিপূর্ণ, তাতে সুসংবাদ, সতর্কবাণী, আহকাম ও আদব সকল বিষয় রয়েছে। আরো রয়েছে বিবেক ও অনুভূতিকে জাগ্রত করার উপাদান এবং কঠোরতা ও দয়া।

অতএব যখন দেখা যায় যে, এক ফেরকা সুসংবাদ সম্বলিত বাণীসমূহ গ্রহণ করে ধমকি সম্বলিত বাণীসমূহ ত্যাগ করে, পক্ষান্তরে অপর ফেরকা তার বিপরীত ধমকি সম্বলিত বাণীসমূহ গ্রহণ করে

---

[1] সূরা মায়েদা: (১৪)

সুসংবাদ সম্বলিত বাণীসমূহ ত্যাগ করে, তখন উভয়ের মাঝে শত্রুতা, বিদ্বেষ ও বিভক্তি অপরিহার্য হয়।

অনুরূপই ঘটে যখন এক ফেরকা আহকাম ত্যাগ করে শুধু আদব গ্রহণ করে, অথবা আমল ও জিহাদ ত্যাগ করে শুধু দুনিয়াবিমুখতা ও বৈরাগ্যপনা গ্রহণ করে। বিভিন্ন ফেরকার বাস্তবতা এটাই প্রমাণ করে স্পষ্টভাবে:

১. তাই তো দেখা যায় খারেজিরা শুধু ভীতিপ্রদর্শন সংক্রান্ত বাণীসমূহ গ্রহণ করেছে, ফলশ্রুতিতে তারা কবিরা গুনাহকারীর ঈমান প্রত্যাখ্যান, সুপারিশ অস্বীকার ও আল্লাহর প্রশস্ত রহমতকে সংকীর্ণ করেছে।

পক্ষান্তরে মুরজিয়ারা গ্রহণ করেছে শুধু সুসংবাদের বাণীগুলোকে, ফলে তারা বলে: মানুষ শির্ক ব্যতীত যত বড় পাপ করুক তার ঈমান পরিপূর্ণ থেকে যাবে।

২. অনুরূপভাবে শিয়ারা শুধু আলী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর ফযিলত গ্রহণ করে আবুবকর, ওমর ও উসমান রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমের ফযিলত অস্বীকার করেছে। তাদের কেউ আলীকে ইলাহ এবং অপর তিনজনকে কাফির পর্যন্ত বলেছে। পক্ষান্তরে খারেজিরা বলে: আলী নিঃসন্দেহে কাফির।

৩. তদ্রূপ মুতাকাল্লিমরা (মু‘তাযিলা, আশায়েরা ও মাতুরিদিয়ারা) বলে: ইসলাম তো বিবেক ও যুক্তির দীন। বস্তুত তাদের এ কথা

ঠিক, কিন্তু তারা সীমালঙ্ঘন করেছে বিবেকের মূল্য নির্ধারণে, ফলে ওহির ক্ষেত্রেও তারা বিবেককে বিচারক মানে। ফলে তারা অস্বীকার করেছে কারামত, জাদু, কবরের আযাব, মীযান, পুল সিরাত ও অন্যান্য গায়েবী বস্তুকে, কারণ—তাদের ধারণায়—তা বিবেক পরিপন্থী, যদিও কতক বিষয়ে তাদের মাঝেও মতভেদ রয়েছে।

সূফীরা মুতাকাল্লিমদের মোকাবিলা করেছে উল্টোভাবে, ফলে তারা বিবেকের মূল্য ও গবেষণাকে অস্বীকার করে ঈমান এনেছে ধারণা, কুসংস্কার ও স্বপ্নের উপর। এগুলোকে তারা কাশফ, কারামত ও হাকিকত বলে।

৪. কাদারিয়ারা বান্দার বাসনা, ইচ্ছা ও জবাবদিহিতা প্রমাণকারী দলিলসমূহকে প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করেছে। বস্তুত তাদের একাজ সঠিক, কিন্তু তারা অস্বীকার করেছে তাকদীরকে ও তাকদীর প্রমাণকারী দলিলসমূহকে।

জাবরিয়ারা তাদের মোকাবিলা করেছে উল্টোভাবে, তাকদীর প্রমাণ করেই ক্ষান্ত হয়নি তারা, বরং তাতে বাড়াবাড়িও করেছে, ফলে মানুষকে সকল কর্মের ব্যাপারে তারা অপারগ জ্ঞান করে, তারা অস্বীকার করে কাদারিয়াদের সকল দলিল।

৫. মুমাসসিলা ও মুশাববিহা (আল্লাহর সাথে সাদৃশ্যস্থাপনকারী ও উপমা নির্ধারণকারী) ফেরকা শুধু আল্লাহর সিফাত প্রমাণকারী দলিলসমূহ গ্রহণ করে, কিন্তু যেসব দলিল প্রমাণ করে যে আল্লাহর

সিফাতসমূহ কোনো মখলুকের সিফাতের মত নয় সেগুলোকে তারা পরিহার করে।

পক্ষান্তরে মুআত্তিলা তথা আল্লাহর সিফাৎ অকার্যকরকারী ফেরকা মখলুক থেকে কোনো বস্তু আল্লাহর সাদৃশ্য নেই প্রমাণকারী দলিল গ্রহণ করেছে, কিন্তু আল্লাহর সিফাত প্রমাণকারী সকল দলিল তারা ত্যাগ করেছে। এভাবে আল্লাহ তা'আলাকে সাদৃশ্য থেকে পবিত্র করার দোহাই দিয়ে তারা আল্লাহর সিফাতকে অস্বীকার করেছে।

৬. ইসলামি জীবনের বাস্তবতা থেকে তার উদাহরণ:

* পার্থিব জীবন উপকরণে, একদল আলেম ও ইসলামি আইনজ্ঞ ব্যাপকভাবে স্বচ্ছলতা গ্রহণ করেন।

পক্ষান্তরে তাদের বিরোধিতা করেন অপর দল দুনিয়া ত্যাগ করে ও ইবাদতে মশগুল থেকে, তারা হালাল ও পবিত্র বস্তুর বিরুদ্ধেও যুদ্ধ ঘোষণা করেন।

* ইলমের ময়দানে, একদল আলেম শুধু লিপিবদ্ধ করা ও বর্ণিত ইলম সংগ্রহে মনোনিবেশ করেছে, এমন কি তারা দুর্বল, বানোয়াট ও ভ্রান্ত গল্প পর্যন্ত জমা করেছে।

তাদের মোকাবিলা করেছে অপর দল শুধু বুঝ ও গবেষণায় আত্মনিয়োগ করে, তারা অনেক সহি ইলম থেকে বঞ্চিত হয়েছে, অথবা তা ত্যাগ করেছে।

* দাওয়াতের ময়দানে, একদল জিহাদ ও শক্তি প্রদর্শনের দিকে আহ্বান করে, অপর দল আখলাক ও আদবের দিকে আহ্বান করে, তৃতীয় দল ইলম ও গবেষণার দিকে আহ্বান করে অন্যান্য শাখা ত্যাগ করে, তাই বিরোধ ও বিরোধিতা ব্যাপকভাবে সংঘটিত হচ্ছে। এটাই বাস্তবতা, মুসলিমরা যদি পূর্ণ কিতাব আঁকড়ে ধরে পরিপূর্ণ বুঝ ও সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রথম জামা'আত তথা সাহাবায়ে কিরামের আদর্শ অনুসরণ করত, তাহলে এ বিরোধ বা অধিকাংশ বিরোধ হত না। আর সে জন্যই সাহায্যপ্রাপ্ত মুক্তিপ্রাপ্ত দল তথা আহলে সুন্নত ওয়াল জামা'আত সে দিকেই আহ্বান করছে।

তৃতীয়ত: ইসলামের শত্রুদের ষড়যন্ত্র

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَـٰرَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَىٰ ۗ وَلَئِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم بَعْدَ ٱلَّذِى جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِىٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿١٢٠﴾ ﴾ [البقرة: ١٢٠]

"আর ইয়াহূদী ও নাসারারা কখনো তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না, যতক্ষণ না তুমি তাদের মিল্লাতের অনুসরণ কর। বল, নিশ্চয় আল্লাহর হিদায়েত-ই হিদায়েত। আর যদি তুমি তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ কর, তোমার কাছে যে জ্ঞান এসেছে তার পর, তাহলে

আল্লাহর বিপরীতে তোমার কোনো অভিভাবক ও সাহায্যকারী থাকবে না”।[1] আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن تُطِيعُواْ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَرُدُّوكُمۡ عَلَىٰٓ أَعۡقَٰبِكُمۡ فَتَنقَلِبُواْ خَٰسِرِينَ ١٤٩ ﴾ [ال عمران: ١٤٩]

“হে মুমিনগণ, তোমরা যদি কাফেরদের আনুগত্য কর, তাহলে তারা তোমাদেরকে তোমাদের পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যাবে, ফলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে ফিরে যাবে”।[2]

অতএব ইসলামের দুশমনরা আল্লাহর নূর নিষ্প্রভ ও মনোনীত উম্মত ধ্বংসের জন্যে রাত-দিন কাজ করে। এ ময়দানে তারা সবাই একমত, যদিও তাদের দীন ও মত ভিন্ন।

এক বিবেচনায় এ উম্মতের জন্য এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে এক পরীক্ষা, অপর বিবেচনায় এটি উম্মতের জন্য শাস্তি ও সংশোধন।

ইসলাম বাতিল ধর্মসমূহ নিঃশেষ, ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারী সংস্থাসমূহ ধ্বংস ও জালেম শাসকদের পতন ঘটিয়েছে, প্রবৃত্তি ও খারাপ মনোবৃত্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, অতএব এতে আশ্চর্যের কিছু নেই যে, ঐসব কিছুর অনুসারীরা ইসলামের বিরুদ্ধে শত্রুতা ও তার ধ্বংসের জন্য চেষ্টা করবে এবং তাতে বাতিল আকিদার অনুপ্রবেশ ঘটাবে। বস্তুত

---

[1] সূরা আল-বাকারা: (১২০)

[2] সূরা আলে-ইমরান: (১৪৭)

তার অংশ হিসেবে তারা মুসলিমদের মাঝে বিভিন্ন দল সৃষ্টি এবং তাতে বিদ‘আত ও গোমরাহির বীজ বপন করছে।

অনুরূপভাবে আমরা সেসব চক্রান্তকারী শয়তানদের দেখতে পাই যে তারা বিভিন্ন গোমরাহ দল প্রতিষ্ঠা করে, অথবা নিজেদেরকে গোমরাহ দলে ঢুকিয়ে তার গোমরাহি বৃদ্ধি করে বা দুর্বল বিবেক সম্পন্নদের অন্তরে সন্দেহ ও গোমরাহি ছুড়ে মারে, এক সময় তা কোনো কোনো দলের মূলনীতিতে পরিণত হয়, যেমন:

১. ‘কট্টর শিয়া’ ফেরকা প্রতিষ্ঠাতা করেছে আব্দুল্লাহ ইবনে সাবা ইয়াহূদী।

২. ‘কট্টর মু‘তাযিলা’ ফেরকা প্রতিষ্ঠাতা করেছে ইবরাহিম আন-নাযযাম ও আবুল হুযাইল আল-‘আল্লাফ। তারা উভয়ে যিন্দিক অগ্নিপূজক দলের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

৩. ‘বাতেনি ফেরকা’ প্রতিষ্ঠা করেছে আব্দুল্লাহ ইবনে মায়মুন আল-কাদ্দাহ। সে পারস্যের বংশোদ্ভূত ইয়াহূদী ছিল।

৪. আল্লাহর সিফাৎ অস্বীকার করার ভ্রান্ত মতবাদ ইয়াহূদী ও সাবেয়ী দার্শনিকদের থেকে গ্রহণ করেছে জা‘দ ইবনে দিরহাম ও জাহাম ইবনে সাফওয়ান।

৫. তাকদীর অস্বীকার করার মতবাদ কতিপয় খৃস্টান দার্শনিকদের থেকে গ্রহণ করেছে মা‘বাদ আল-জুহানি ও গায়লান আদ-দামেস্কি।

৬. ইসলামের মধ্যে সর্বপ্রথম তাসাউফ আবিষ্কার, প্রতিষ্ঠা ও তার নামকরণ করে কতক হিন্দু ও অগ্নিপূজক যিন্দিক, যেমন আবদুক ও কুলাইব। অতঃপর বিস্তার লাভ করে এবং তাতে চরমপন্থি ও মধ্যপন্থী সবাই প্রবেশ করেছে।

মতবিরোধ সংঘটিত হয়েছে এমন কতক মৌলিকনীতি

প্রথমত: ঈমান

কুরআন ও সুন্নাহ প্রমাণ করে, ঈমান কথা ও কর্ম উভয়ের নাম, বর্ধিত হয় ও হ্রাস পায়, এ নীতির উপর ঐকমত্য পোষণ করেছেন সকল সাহাবি ও আদর্শ পুরুষগণ। এটাই আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের মাযহাব।

এতে জামা'আতের বিরোধিতা করেছে দু'টি দল:

ক. খারেজি ও মু'তাযিলা:

তাদের মাযহাব ঈমান একক বস্তু, বাড়েও না, কমেও না। ঈমান হচ্ছে সকল ইবাদাত আঞ্জাম দেওয়া ও সকল হারাম বস্তু ত্যাগ করা। যে কোনো ওয়াজিব ত্যাগ করল অথবা কোনো হারাম কাজ করল, সে খারেজিদের নিকট কাফির। আর মু'তাযিলাদের নিকট ঈমান ও কুফরের মধ্যবর্তী স্তরে, তবে উভয় ফেরকার নিকট সে আখেরাতে স্থায়ীভাবে জাহান্নামী।

খ. মুরজিয়া:

তাদের মাযহাব হচ্ছে ঈমান একক বস্তু, বাড়েও না কমেও না। অর্থাৎ ঈমান হচ্ছে তাসদিক (বা সত্যারোপ করা) অথবা শুধু অন্তর দিয়ে জানা, মুখের স্বীকারোক্তি ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমল ব্যতীত। এটা চরমপন্থি মুরজিয়াদের মতবাদ। অথবা অন্তর দ্বারা সত্যারোপ করা ও

মুখে স্বীকার করা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমল ব্যতীত। এটা অবশিষ্ট মুরজিয়াদের মতবাদ।

তাদের মাযহাব হচ্ছে, যে কেউ কোনো ওয়াজিব ত্যাগ করল অথবা কোনো হারাম কাজ করল, সে পূর্ণ মুমিন, যতক্ষণ পর্যন্ত তার মধ্যে তাসদিক (দৃঢ় বিশ্বাস) অথবা দৃঢ় বিশ্বাস ও ইকরার (স্বীকারোক্তি) বিদ্যমান রয়েছে।

এ হচ্ছে তাদের মতবাদ, অথচ আহলে-সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আকিদা হচ্ছে: যে কেউ কোনো ওয়াজিব ত্যাগ করল অথবা কোনো হারাম কাজ করল, কিন্তু ওয়াজিবকে অস্বীকার বা হারামকে হালাল জানে নি, সে অসম্পূর্ণ ঈমানের অধিকারী, তার বিষয়টি আল্লাহর উপর ন্যস্ত, যদি তিনি চান তাকে শাস্তি দিবেন, আর যদি তিনি চান তাকে ক্ষমা করবেন।

দ্বিতীয়ত: কাদর বা তাকদীর:

কুরআন ও সুন্নাহর দলিল প্রমাণ করে, তাকদীরের উপর ঈমান ঈমানের রুকনসমূহ থেকে একটি রুকন এবং দীনের মূলনীতি থেকে একটি মূলনীতি। এটাই আহলে-সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের মাযহাব।

এ মাসআলায় দু'টি ফেরকা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত থেকে বিচ্যুত হয়েছে:

ক. কাদারিয়া: যারা তাকদীর অস্বীকারকারী, এটা মু'তাযিলা ও অধিকাংশ শিয়াদের মাযহাব।

খ. জাবরিয়া: বান্দার বাসনা ও ইচ্ছাকে অস্বীকারকারী, এরা জাহমিয়া। এ ব্যাপারে তাদের নিকটবর্তী ফেরকা হচ্ছে আশ‘আরিয়া ফেরকা।

তৃতীয়ত: আল্লাহর নাম ও গুণাবলি:

আল্লাহ তা‘আলাকে তার নাম ও গুণাবলিসহ জানা সবচেয়ে উত্তম ইলম ও সর্বোৎকৃষ্ট মারেফাত, তাছাড়া অন্তর তৃপ্ত ও প্রশান্ত হয় না তার মাবুদকে চেনা ব্যতীত। অনুরূপ আল্লাহর নাম ও সিফাতের প্রতি ঈমান এবং তার দাবি ইয়াকিন (দৃঢ় বিশ্বাস), ইখলাস, আল্লাহর ভয় ও আশা বাস্তবায়ন করা ব্যতীত অন্তর সত্যের উপর অবিচল থাকার যোগ্য হয় না, থাকতেও পারে না।

নেককার আদর্শ পূর্বপুরুষগণ আল্লাহর যেসব নাম ও গুণাবলি কুরআন ও সুন্নায় এসেছে তার প্রত্যেকটির উপর ঈমান এনেছে। সেগুলোর চাহিদা বাস্তবায়ণ করেছে। সেগুলোর উপর ঈমান আনার কারণে আবশ্যক বিষয়াদি বাস্তবায়ন করেছে, তাই আল্লাহ সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি ইলম ও মারেফাতের অধিকারী ছিল তারা। অনুরূপ তারা ছিল আল্লাহকে অধিক ভয়কারী, আল্লাহর নির্দেশের অধিক পালনকারী ও তার শরীয়তের অধিক অনুসারী।

তারা আল্লাহর সকল নাম ও গুণাবলি সাব্যস্ত করার সাথে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করত যে, আল্লাহর কোনো উদাহরণ নেই, কোনো সাদৃশ্য নেই, কোনো সমকক্ষ ও শরীক নেই। তিনি বলেন:

﴿ لَيۡسَ كَمِثۡلِهِۦ شَيۡءٞۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡبَصِيرُ ١١ ﴾ [الشورى: ١١]

“তার মত কোনো বস্তু নেই, তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা”।[1]

তারা আল্লাহর সিফাৎ তথা যাবতীয় গুণাবলী সাব্যস্ত করে, তবে তার সাদৃশ্য অস্বীকার করে। তারা বিশ্বাস করে যে, সৃষ্টিকুল থেকে কোনো বস্তু যেরূপ আল্লাহর সত্তার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়, তেমনি কোনো বস্তু তার সিফাতের সাথেও সাদৃশ্যপূর্ণ নয়।

আল্লাহর অস্তিত্ব যেরূপ মখলুকের অস্তিত্বের মত নয়, অনুরূপ তার সিফাতও মখলুকের সিফাতের মত নয়।

এ আকিদায় দু'টি দু'টি ফেরকা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত ত্যাগ করেছে:

ক. এক ফেরকা মখলুকের সিফাতের ন্যায় আল্লাহর সিফাত সাব্যস্ত করে, অতঃপর বলে: আল্লাহর ইলম আমাদের ইলমের ন্যায়, তার হাত আমাদের হাতের ন্যায়। অথচ আল্লাহ এসব থেকে অনেক মহান। তাদেরকে মুশাব্বিহাহ (উপমা প্রদানকারী) বলা হয়। এটাই ছিল শিয়া ও রাফেদিদের পূর্বসূরিদের মাযহাব।

খ. অপর ফেরকা আল্লাহর সিফাতকে অস্বীকার করে। তাদের ধারণা সিফাত সাব্যস্ত করলে সাদৃশ্য অবশ্যম্ভাবী হয়, অতএব তারা বলে:

[1] সূরা মায়েদাহ: (১১)

আল্লাহর চেহারা ও হাত নেই, তার কুদরত ও ইলম নেই। তাদেরকে আসহাবে তা'তিল, অথবা মু'আত্তিলা বলা হয়, তারা কয়েক ভাগ:

১. আল্লাহর সকল নাম ও গুণাবলি অস্বীকারকারী, তারা জাহমিয়া।

২. আল্লাহর সকল নাম সাব্যস্তকারী, তবে তার সকল সিফাত অস্বীকারকারী, তারা বলে উদাহরণস্বরূপ: আল্লাহ ইলম ছাড়া মহাজ্ঞানী, কুদরত ছাড়া মহা ক্ষমতাধর। তারা মু'তাযিলা।

৩. কতক সিফাত অস্বীকারকারী ও কতক সিফাত সাব্যস্তকারী, তবে সকল নাম সাব্যস্তকারী। তারা আশ'আরি। তারা আল্লাহর উর্ধ্বারোহণ, আরশের উপর উঠা, হাত, রাগ করা ও সন্তুষ্টি হওয়া ইত্যাদিকে অস্বীকার করে[1]।

চতুর্থত: ইমামত:

এ ব্যাপারে নেককার পূর্বপুরুষদের আকিদা হচ্ছে:

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর খিলাফতের অধিক যোগ্য আবুবকর, অতঃপর উমর, অতঃপর উসমান, অতঃপর আলী— আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হোন—, ইমামগণ হবেন কুরাইশদের থেকে, তাদের থেকে ইমামত ছিন্ন হবে না, এটাই সহি সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত। ইমামত একটি শরয়ী পদ, তার উদ্দেশ্য দীন প্রতিষ্ঠা করা ও তার মাধ্যমে দুনিয়া পরিচালনা করা। ইমাম নির্বাচন করার নীতি

---

[1] তারা হচ্ছে আশায়েরা ও মাতুরিদিয়া ফেরকাদ্বয়। [সম্পাদক]

শুরা বা পরামর্শভিত্তিক। আলেম, জ্ঞানী ও প্রভাবশালীদের থেকে পরামর্শক ও কার্যনির্বাহী গ্রহণ করা হবে।

এ আকিদায় দু'টি ফেরকা দু'টি ফেরকা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত ত্যাগ করেছে::

১. শিয়া: তাদের মাযহাব খিলাফতের অধিক যোগ্য আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু। তারা পূর্ববর্তী তিনজনের খিলাফতের ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করে। অবশ্য তাদের অপর ফেরকা যায়দিয়ারা বলে: পূর্ববর্তী তিনজনের খিলাফত সঠিক ছিল, কিন্তু আলী তাদের থেকে উত্তম।

অবশিষ্ট শিয়ারা বলে: পূর্ববর্তী তিনজনের খিলাফত বাতিল, তারা তাদেরকে গালমন্দ ও অভিসম্পাত করে। শিয়াদের নিকট ইমামত শুধু একটি শরয়ী পদ নয়, বরং দীনের রুকনসমূহ থেকে একটি রুকন এবং তার মৌলিক বিষয় থেকে একটি বিষয়।

ইমাম নির্বাচনের নীতি উত্তরাধিকার এবং তা হুসাইনের সন্তানের মধ্যে সীমাবদ্ধ, তাদের থেকে ইমামত কখনো বিচ্ছিন্ন হবে না।

২. খারেজি: তারা বড় দুই খলিফা আবু বকর ও উমরের খিলাফত স্বীকার করে, কিন্তু উসমান আলীকে অপবাদ দেয়, কখনো তাদেরকে কাফের বলে। তারা বলে: কুরাইশ ও গায়রে কুরাইশ সকল মানুষের ক্ষেত্রে ইমামত বৈধ।

মুক্তিপ্রাপ্ত জামা‘আতের গুণ ও বৈশিষ্ট্যাবলী

মুক্তিপ্রাপ্ত জামা‘আতের অনেক গুণ রয়েছে, তবে প্রত্যেক গুণের উৎস নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী:

«من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي»

“আজ যার উপর আমি ও আমার সাথীগণ রয়েছে তার উপর যে থাকবে (সে মুক্তিপ্রাপ্ত)”। এ নীতি ও আদর্শ বলে মুক্তিপ্রাপ্ত দল সকল যুগে বহু বৈশিষ্ট্যগুণে অন্যান্য ফেরকা থেকে স্বতন্ত্র ছিল।

প্রথমত: মুক্তিপ্রাপ্ত দলের গুণাবলি:

১. আল্লাহর কিতাব ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত অনুসরণ করা, তার উপর কোনো বস্তুকে প্রাধান্য না দেওয়া, না বিবেককে, না মতামতকে, না কাশফকে, না মাযহাবকে, না বিশেষ তরিকাকে, না কোনো মানুষের কথাকে, না তার ফয়সালা ও বিধানকে। তাই আল্লাহর কিতাবের হিফয, তিলাওয়াত ও তাফসীরের প্রতি তারা বিশেষ গুরুত্বারোপ করে, যেরূপ গুরুত্বারোপ করে সহি হাদিস জানা এবং তাকে দুর্বল ও জাল হাদিস থেকে পৃথক করার ক্ষেত্রে। এ জন্য তারা অনেক শ্রম ব্যয় করে।

২. দীনের মধ্যে বিদ‘আত সৃষ্টি না করা, বিদ‘আতকে সর্বাত্মক প্রতিরোধ করা এবং পথভ্রষ্টতা ও গোমরাহি দূরীভূতকরণে কুরআন ও সুন্নার নীতি অনুসরণ করা। অতএব তারা বিদ‘আতকে বিদ‘আত

দ্বারা প্রতিহত করে না এবং দীনের কতক অংশ প্রমাণ করার জন্য কতক অংশকে ত্যাগ করে না।

৩. পূর্ণাঙ্গভাবে দীনে প্রবেশ করা ও পূর্ণ কিতাবের উপর ঈমান আনয়ন করা, অতএব তারা সুসংবাদপ্রদানকারী ও ভীতি প্রদর্শনকারী উভয় প্রকার বাণীর উপর ঈমান আনে, যেরূপ তারা ঈমান আনে আল্লাহর সিফাত সাব্যস্তকারী ও সৃষ্টির গুণ থেকে পবিত্রতা ঘোষণাকারী বাণীসমূহের উপর। তারা তাকদীরের প্রতি ঈমান এবং বান্দার বাসনা ও ইচ্ছা সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে সমন্বয় করে, যেভাবে দলিল দ্বারা প্রমাণিত হয়... এবং এভাবেই সামনে অগ্রসর হয়।

অনুরূপ তারা সমন্বয় করে ইলম ও ইবাদত, শাস্তি ও রহমত এবং দুনিয়ার জন্য কাজ করা ও দুনিয়াবিমুখতার মাঝে, অতএব তাদের নীতি একমাত্র নীতি, যেখানে ইসলামের পূর্ণতা, ব্যাপকতা ও সামঞ্জস্যতা বাস্তবায়িত হয়।

৪. সত্যের উপর মুসলিমদের কথাকে এক করা, তাওহীদ ও আনুগত্যের ভিত্তিতে তাদেরকে জামা'আতবদ্ধ রাখার চেষ্টা করা।

এ কারণে তারা সুন্নত ও জামা'আত ব্যতীত অন্য কোনো নাম গ্রহণ করে উম্মত থেকে বিচ্ছিন্ন হয় নি, সুন্নত ও জামা'আতের বন্ধন ব্যতীত কোনো বন্ধনে তারা বন্ধুত্ব ও শত্রুতা পোষণ করে না।

৫. সুন্নত জীবিত করা ও আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেওয়া, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা, আল্লাহর রাস্তায়

জিহাদ করা, প্রত্যেক ছোট ও বড় বিষয়ে আল্লাহর শরীয়ত ও বিধান বাস্তবায়ন করার নিমিত্তে কাজ করা। আল্লাহর ব্যাপারে কোনো তিরস্কারকারীর তিরস্কার তাদেরকে প্রভাবিত করে না।

দ্বিতীয়ত: মুক্তিপ্রাপ্ত দলের বৈশিষ্ট্য:

বিভিন্ন ফেরকার ইতিহাস ও তাদের অবস্থা অনুসন্ধানকারী দেখবে যে, নাজাতপ্রাপ্ত দল অন্যান্য ফেরকা থেকে স্পষ্ট কতক বৈশিষ্ট্যের কারণে আলাদা, যেমন:

১. সামষ্টিকভাবে থাকা ও বিচ্ছিন্ন না হওয়া:

নাজাতপ্রাপ্ত দল মৌলিক আকিদায় এক, যদিও তাদের দেশের দূরত্ব ও যুগের ব্যবধান অনেক। তার একমাত্র কারণ তাদের সবার উৎস এক, এক উৎস থেকে সবাই গ্রহণ করে, গ্রহণ করার নীতিও এক। পক্ষান্তরে নাজাতপ্রাপ্ত দল ব্যতীত অন্যান্য ফেরকার অবস্থা হচ্ছে যে, তাদের এক ফেরকা সৃষ্টি হতে না-হতে তার থেকে অপর ফেরকা সৃষ্টি হয়, এক ফেরকা অপর ফেরকাকে কাফের বলে, বরাবর দলে দলে বিভক্ত হতে থাকে।

২. মধ্যপন্থা অবলম্বন করা, বাড়াবাড়ি অথবা শিথিলতা না করা:

ঈমানের বিষয়ে তারা খারেজি ও মুরজিয়াদের অপেক্ষা মধ্যপন্থার অনুগামী, সিফাতের বিষয়ে তারা মুশাব্বিহা ও মু'আত্তিলাদের অপেক্ষা মধ্যপন্থার অনুসারী, তাকদীরের বিষয়ে তারা কাদরিয়া ও

জাবরিয়াদের অপেক্ষা মধ্যপন্থার অনুসারী এবং সাহাবিদের বিষয়ে তারা শিয়া ও খারেজিদের অপেক্ষা মধ্যপন্থা অনুসারী।

৩. হুকুম দেওয়ার বিষয়ে মহান আল্লাহর হকের প্রতি খেয়াল রাখা:

নাজাতপ্রাপ্ত দল নফসের হক অথবা স্বদল দেখে না, তার বিবেচনায় ফয়সালা করে না, বরং তারা বন্ধু ও শত্রুর মাঝে ইনসাফ ও ন্যায়ের সাথে সমানভাবে ফয়সালা করে। আল্লাহ ও তার রাসূল যাকে কাফের বলেছেন তাকে ব্যতীত কাউকে তারা কাফের বলে না, আল্লাহ ও তার রাসূল যাকে ভুল বলেছেন তাকে ব্যতীত কাউকে তারা ভুল বলে না, কারো অধিকার বা মর্যাদাকে তারা অস্বীকার করে না।

এ নীতি ও আদর্শ অন্যান্য ফেরকার নীতি ও আদর্শের বিপরীত, অন্যান্য ফেরকা নফসের স্বার্থ চায়, প্রবৃত্তি দ্বারা ফয়সালা করে ও দলের পক্ষাবলম্বন করে।

৪. সম্পৃক্ত ও সংশ্লিষ্টতার ক্ষেত্রে তারা রাব্বানি:

নাজাত প্রাপ্ত দল যেরূপ স্বীয় উৎস ও নীতির বিষয়ে রাব্বানী, সেরূপ সম্পৃক্ত ও সংশ্লিষ্টতার বিষয়েও তারা রাব্বানী। তারা কোনো ব্যক্তি, তরিকা ও (আকিদাগত) মাযহাবের সাথে সম্পৃক্ত হয় না, বরং তার সদস্যরা সম্পৃক্ত হয় ইসলাম ও সুন্নতের সাথে, এ জন্য তাদেরকে বলা হয়: (আহলে সুন্নাহ) ও (আহলে হাদিস অথবা আহলে আসর), অথবা সালাফ তথা পূর্বসূরিদের অনুসারী ইত্যাদি।

এ নীতি ও আদর্শ অন্যান্য ফেরকার নীতি ও আদর্শের বিপরীত, তারা সম্পৃক্ত হয় কোনো ব্যক্তির সাথে অথবা কোনো বিদ‘আতির মতের সাথে অথবা কোনো বিদ‘আতি তরিকার সাথে।

বিভিন্ন ফেরকা ও তাদের গুরুত্বপূর্ণ আকিদা

খাওয়ারিজ

খারেজি: একটি ফেরকার প্রতীক, যারা শুধু পাপের কারণে মুসলিমদের কাফির বলে ও তাদের রক্ত হালাল জানে। তারা কট্টর ও গায়রে কট্টর বিভিন্ন দলে বিভক্ত।

মুসলিম জামা'আত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পূর্বে তাদেরকে কুররা তথা অধিক কুরআন তিলাওয়াতকারী বলা হত, তাদের অধিক তিলাওয়াত ও ইবাদতের কারণে। অতঃপর তাদেরকে খাওয়ারিজ ও হারুরিয়া বলা হয়—ইরাকের একটি শহরের সাথে সম্পৃক্ত করে, যার নাম হারুরা—তবে তারা নিজেদের নামকরণ করে শোরা (তথা বিক্রয়কারী) বলে, অর্থাৎ তাদের ধারণায় তারা নিজেদের নফসকে আল্লাহর জন্য বিক্রি করে দিয়েছে।

মুসলিম উম্মাহ বিরোধী অন্যান্য ফেরকা থেকে খারেজিরা বিদ্রোহ, প্রতিরক্ষা ও আক্রমণ পরিচালনার ক্ষেত্রে বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী, যেরূপ তারা বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী বীরত্ব, সত্যবাদিতা ও ইবাদতের ক্ষেত্রে। তবে তাদের এসব গুণাবলী কোনো ভালো ভিত্তির উপর নেই, বরং গোমরাহি ও মূর্খতার উপর প্রতিষ্ঠিত।

নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে তাদের বিষয়ে বিভিন্ন হাদীস প্রমাণিত, সেখানে তাদের কতক বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা, তাদের সাথে যুদ্ধের কঠিন নির্দেশ ও তাদের বিদ'আত থেকে বাঁচার জন্য কঠোর হুশিয়ারি রয়েছে।

খারেজিদের গুরুত্বপূর্ণ কতক ফেরকা:

খারেজিরা অনেক ফেরকায় বিভক্ত, আমরা তার গুরুত্বপূর্ণ কতক ফেরকা উল্লেখ করবো, দীনের মধ্যে বাড়াবাড়ি বা সীমালঙ্ঘনের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে। সীমালঙ্ঘন বিবেচনায় তাদের চরমপন্থি ফেরকা হচ্ছে 'আযা-রিকা', অতঃপর 'নাজদা-ত' এবং সবচেয়ে নমনীয় ফেরকা হচ্ছে 'ইবাদ্বিয়া'।

১. 'আযারিক্বা':

নাফে ইবনে আযরাক্বের অনুসারীদের আযারিক্বা বলা হয়, যার বিষয়টি আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর যুগে আত্মপ্রকাশ করে।

তাদের গুরুত্বপূর্ণ আকিদা:

ক. উসমান ও আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমাকে কাফির বলা।

খ. কবিরা গুণাহকারীকে কাফির ও চিরস্থায়ী জাহান্নামী বলা।

গ. মুসলিমদের থেকে যারা তাদের বিরোধিতা করে তাদেরকে কাফির বলা, বরং তাদের নিকট যে হিজরত করে চলে আসে নি সেও কাফির, যদিও সে তাদের মাযহাবের অনুসারী হয়।

ঘ. তাদের বিরোধী মুসলিম দেশকে দারুল কুফর (কাফির রাষ্ট্র) হিসেবে ফতোয়া প্রদান করা।

ঙ. বিবাহিতের যিনা-ব্যভিচারের শাস্তি হিসেবে পাথর নিক্ষেপ অনুরূপভাবে অপবাদ আরোপের শাস্তি রহিত করা।

২. নাজদাত:

নাজদাহ ইবনে আমির আল-হানাফির অনুসারীদের নাজদাত বলা হয়, সে মূলত নাফে ইবনে আযরাক্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হয় এবং তার কতক বাড়াবাড়ি শিথিল করে।

তাদের গুরুত্বপূর্ণ আকিদা:

ক. মুসলিমদের থেকে তাদের বিরোধীকে কাফির বলা— এমনকি তাদের পূর্বসূরী আযারিক্বা ফেরকাও এদের মতে কাফের —তবে মূর্খ ব্যতীত, মূর্খের ওযর তারা গ্রহণ করে যতক্ষণ না তার উপর প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত করা না হয়।

খ. তাদের বিরোধীদের দেশকে নেফাকের দেশ বলা, কুফরি দেশ নয়।

গ. অপরাধী ও শাস্তি উপযোগীদের পক্ষ নেওয়া, যদি তারা তাদের মাযহাব অনুসারী হয়, অবশ্য এটা বলে যে তারা চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামী।

ঘ. মুমিন ব্যক্তিকে—অর্থাৎ তাদের মাযহাবের অনুসারীকে—শুধু কবিরা গুনাহের কারণে কাফির না বলা, যেরূপ আযারিক্বা ফেরকা

বলে থাকে। বরং কুফরি তখনই হবে, যখন পাপে অবিচল থাকবে, সে পাপ বড় হোক বা ছোট হোক।

৩. ইবাদ্বিয়া:

আব্দুল্লাহ ইবনে আবাদ্ব আত-তামিমির অনুসারীদের ইবাদ্বিয়া বলা হয়, সেও নাফে ইবনে আযরাক্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। একজন তাবেয়ী আবুশ শা'শা জাবের ইবনে যায়েদকে তারা খুব সম্মান করে এবং তার সাথে তারা নিজেদের মাযহাবকে সম্পৃক্ত করে।

খারেজিদের থেকে একমাত্র ইবাদ্বিয়া ফেরকা বর্তমান পর্যন্ত চলমান আছে। প্রথম শতাব্দী শেষে যেসব ফেরকা ও বিদ'আত সৃষ্টি হয়, তার দ্বারা তারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়, বিশেষভাবে মু'তাযিলাদের দ্বারা।

তাদের গুরুত্বপূর্ণ আকিদা:

ক. আল্লাহর সিফাৎ অস্বীকার করা, এ ব্যাপারে তারা মু'তাযিলাদের মাযহাব অনুসরণ করে।

খ. কুরআনুল কারিম মাখলুক বা সৃষ্ট।

গ. কবিরা গুণাকারী চিরস্থায়ী জাহান্নামী, তা থেকে সে কখনো বের হবে না, তবে এ কারণে তারা তাকে বড় কুফরিতে লিপ্ত বলে না।

ঘ. আখিরাতে আল্লাহর দীদার বা দর্শন সাব্যস্তকারী কাফির।

ঙ. শরীয়তের বিধি-বিধানের অপব্যাখ্যা করা, সুতরাং তারা আল্লাহর সিফাত বা গুণাবলীকে অপব্যাখ্যা করে, অনুরূপভাবে তারা ব্যাখ্যা করে সিরাত ও মীযানকে।

অধ্যয়নের জন্য মূল পাঠ[1]

‘ইযালাতুল ই‘তিরাদ্ব আন-মুহিক্কি আলে-ইবাদ্ব’ গ্রন্থ থেকে নির্বাচিত অংশ।

“অতঃপর... এটা ইবাদ্বিয়া ওহবিয়ার আকিদা। মৌলিক ও আনুষঙ্গিক মাসআলায় তারাই আহলে হক (বা হক পন্থী):

অতএব, মৌলিক বিষয়ে তাদের আকিদা: ‘আল্লাহ ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই’, মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ তার বান্দা ও রাসূল এবং তিনি যা নিয়ে এসেছেন সব সত্য এ সাক্ষ্য প্রদান করা।

আল্লাহ তা‘আলা বিদ্যমান, কোনো বস্তু তার সদৃশ নন এবং তিনিও কোনো বস্তুর সদৃশ নন, না ‘আরদ্বে (বস্তুনির্ভর গুণে) না জাওহারে (মূল সত্তায়)। আর না জাওহার ফারদে, (সুক্ষ্ম মূল অনুকণায়) যারা জাওহার ফারদে বিশ্বাস করেন। (তাদের কথাও বিশুদ্ধ নয়)

“আল্লাহ যৌগিক ও একক বস্তু কোনোটিই নন, তার শুরু ও শেষ নেই। তিনি কোনো স্থানে হুলুল তথা প্রবেশ করা থেকে পবিত্র, অনুরূপভাবে বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করা থেকেও তিনি পবিত্র, তিনি অংশ ও দিক দ্বারা গুণান্বিত নন। আর কুরআন মখলুক বা সৃষ্ট, তবে তার

---

[1] লেখক প্রায় প্রতিটি ফেরকা সম্পর্কে আলোচনা শেষে ‘অধ্যয়নের জন্য মূল পাঠ’ নামে একটি শিরোনাম কায়েম করেছেন। এখানে সংশ্লিষ্ট ফেরকার লেখকদের লিখার মাধ্যমে তার আলোচনার সাক্ষী পেশ করেছেন।

ইলম আল্লাহর, যা নতুন নয়, কাদিম তথা চিরন্তন। সাবালক হওয়ার পর সকল ভালো লোকের সাথে বন্ধুত্ব ও সকল খারাপ লোকের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা ওয়াজিব। ইহকাল ও পরকালে আল্লাহকে দেখা যাবে না, না চোখে, না অন্তরে; কারণ অন্তরের দর্শনও আল্লাহর দিক ও সীমাবদ্ধতাকে আবশ্যক করে তুলে আর স্থান ও কালে তার অন্তরীণতা, রঙ ও যুক্তাবস্থাকে অপরিহার্য করে। আবার পরবর্তী অবস্থার জন্য আল্লাহর অপারগতা, অথবা দুর্বলতা ও মুখাপেক্ষিতা ইত্যাদি সৃষ্টজীবীয় বিশেষণকে আবশ্যক করে তুলে.... (সুতরাং আল্লাহকে কখনও দেখা যাবে না)...

আমাদের সাথীগণ বলেছেন, দীনের দাবি হচ্ছে মুশরিকের মত ফাসিক স্থায়ীভাবে জাহান্নামে থাকবে; কারণ আল্লাহর বাণী ব্যাপক, তিতিনি বলেন:

﴿ وَمَن يَعۡصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَإِنَّ لَهُۥ نَارَ جَهَنَّمَ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ٢٣ ﴾ [الجن: ٢٣]

“আর যে আল্লাহ ও তার রাসূলের অবাধ্যতা পোষণ করে, তার জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন। তাতে তারা চিরস্থায়ী হবে”।[1]

ফাসিকের জাহান্নামে চিরকাল না থাকার হাদিসগুলো বানোয়াট, অথবা তার সনদ ও মতন দুর্বল।[2] আমলের পরিমাণ এবং তার

---

[1] সূরা জিন: (২৩)

[2] এটা তার আকিদা। সত্য কথা হচ্ছে এ সংক্রান্ত বহু হাদিস রয়েছে যার শুদ্ধতার ব্যাপারে উম্মত একমত, তার সংখ্যাও কম নয়।

বিনিময়ে সাওয়াব ও শাস্তির নাম মীযান। আমাদের নিকট এগুলো দীনি বিষয়, কারণ আমল দেহহীন, দেহশীল নয়, দেহহীন বস্তু মাপা যায় না। আর পরকালীন সিরাত (পুল), সিরাতের ধারত্ব ও কাটাযুক্ত পেরেক ইত্যাদি হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার সুক্ষ্ম পর্যবেক্ষণকে, অর্থাৎ যদি তলোয়ারের ধার অথবা চুলের উপর স্থির থাকা সম্ভব হয়, তাহলে সে দিন কোনো কোনো বস্তুর অদৃশ্য থাকা সম্ভব হবে... আর আল্লাহর আরশে ইস্তেওয়া হওয়ার অর্থ হচ্ছে, রাজত্ব এবং তার ইচ্ছার বাইরে কোনো বস্তুর অবাধ্য না হওয়া। আল্লাহর চেহারা মানে হচ্ছে আল্লাহ, যেমন তুমি বল অমুকের চেহারার জন্য অথচ তোমার উদ্দেশ্য স্বয়ং ঐ ব্যক্তি। আল্লাহর হাত অর্থ কুদরত এবং তার চোখ অর্থ রক্ষণাবেক্ষণ।

আর নির্দিষ্ট আকার-আকৃতি ব্যতীত আল্লাহর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রমাণ করা এক ধরণের মূর্খতায় প্রত্যাবর্তন করা, অথচ তাওয়ীল (ব্যাখ্যা) দ্বারা তার থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব..."[1]

---

[1] তাদের পরিভাষা ও গোমরাহী বুঝার জন্যে সামনে আলোচিত মু'তাযিলা ও ইলমে কালামের অধ্যায় পড়ুন।

শিয়া

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর পর সাহাবিগণ আবুবকরের নিকট সর্বসম্মতিতে বায়‘আত গ্রহণ করেন, আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু কিংবা কেউ তাতে বিরোধিতা করেন নি। অনুরূপ ঐকমত্য গঠন হয় ওমরের খিলাফত সম্পর্কে, অতঃপর উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর খিলাফত সম্পর্কে।

যখন ফিতনার সূচনা হল এবং উসমান রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু শহীদ হন, তখন যারা আলী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুকে সমর্থন দেয় ও তার পক্ষে যুদ্ধ করে তাদের উপর প্রয়োগ করা হয় শিয়া শব্দটি। অতঃপর নির্দিষ্ট ফেরকার নাম হয়, যারা বিশেষ আকিদা লালন করে।

যখন উমাইয়া খিলাফতের বিরুদ্ধে যায়েদ ইবনে আলী ইবনে হুসাইন বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং শিয়াদেরকে তার সাথে বিদ্রোহ করার আহ্বান জানান তখন তারা আবুবকর ও ওমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমার সাথে তাকে সম্পর্ক ছেদ করতে বললে তিনি বলেন: “আমি তাদের সাথে কীভাবে সম্পর্ক ছেদ করব, অথচ তারা উভয়ে আমার নানা—অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের—উযীর ছিল, এ জন্য ঐ শিয়া লোকেরা যায়েদ ইবন আলীকে ত্যাগ করে। তাই তিনি বলেন: ‘রাফাদতুমুনী’ (তোমরা আমাকে ত্যাগ করলে)”। তখন থেকে

তাদেরকে যায়েদের অনুসারীদের (যায়দিয়াদের) থেকে পৃথক করে 'রাফেদাহ' বলা হয়।

'শিয়া' নামের আড়ালে অনেক ফেরকা আত্মপ্রকাশ করে, যার কতক ফেরকা ইসলাম থেকে সম্পূর্ণ বাইরে।

আলী ইবনে আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর যুগে শিয়া:

আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর যুগে যখন শিয়াদের উন্মেষ ঘটে তখন তারা তিন ভাগে বিভক্ত ছিল:

১. মুফাদ্দালাহ: (প্রাধান্য দানকারী), তারা আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহুকে আবু বকর ও ওমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমের উপর প্রাধান্য দিত।

২. সাব্বাবাহ: (গালমন্দকারী), তারা আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহুকে প্রাধান্য দেওয়ার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করে, এমন কি আবুবকর ও ওমরকে পর্যন্ত গালমন্দ করে।

৩. গুলাত: (সীমালঙ্ঘনকারী), তারা আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহুকে ইলাহ (উপাস্য) জানে, অর্থাৎ তারা বিশ্বাস করে তিনি ইলাহ, অথবা তার মাঝে ইলাহের কোনো অংশ প্রবেশ করেছে, যেমন খ্রিস্টানরা ঈসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে বিশ্বাস করে। তারা যিন্দিক। তাদেরকে যিন্দিক বলার কারণ: তারা প্রকাশ্যভাবে ইসলামের ঘোষণা দেয়, কিন্তু অন্তরে কুফর গোপন করে।

শিয়াদের ব্যাপারে আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর ফয়সালা:

১. মুফাদদালাহ: আলী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করতেন এবং ঘোষণা দিতেন যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর সর্বোত্তম উম্মত আবুবকর ও ওমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুম, যেমন সহি বুখারিতে তার সূত্রে বর্ণিত আছে।

সহি সূত্রে তার থেকে আরো প্রমাণিত, তিনি বলেছেন:

«لَا أَجِدُ أَحَدًا يُفَضِّلُنِي عَلَى أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، إِلَّا وَجَلَدْتُهُ جَلْدَ حَدِّ الْمُفْتَرِي»

“আবুবকর ও ওমরের উপর আমাকে প্রাধান্য দানকারী ব্যক্তিকে যদি আমার নিকট উপস্থিত করা হয় আমি অবশ্যই তাকে মিথ্যা অপবাদের শাস্তি আশিটি বেত্রাঘাত করবো”।

২. সাব্বাবাহ: তাদেরকে হত্যা করা আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর ফয়সালা ছিল। তার দলের কতক লোক আবুবকর ও ওমরকে গালমন্দ করে, এরূপ কথা তার নিকট পৌঁছলে তিনি তাদেরকে হত্যার জন্য তলব করেন, কিন্তু তারা পলায়ন করে।

৩. গুলাত (যিন্দিক): তাদের ব্যাপারে তার সিদ্ধান্ত ছিল আগুনে পোড়ানো, তিনি পুড়িয়েছেনও, যেমন সহি বুখারিতে প্রমাণিত।

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু তাদেরকে পোড়ানো নিয়ে আপত্তি করেন, কারণ আগুন দিয়ে পোড়ানোর ক্ষেত্রে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, তাই তাদেরকে তিনি তলোয়ার দিয়ে হত্যা করতে বলেন।

আব্দুল্লাহ ইবনে সাবা... ও সীমালঙ্ঘনকারী শিয়াবাদের প্রতিষ্ঠা:

আব্দুল্লাহ ইবনে সাবা ষড়যন্ত্রকারী ইয়াহূদী ব্যক্তি, ইসলামকে ধ্বংস ও বিনষ্ট করার মানসে বাহ্যত ইসলাম প্রকাশ করে। উসমান রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর উপর ফেতনার আগুন প্রজ্বলিত ও তার জীবন নিঃশেষ করার সূচনায় ছিল ইবনে সাবা। অনুরূপ জামাল তথা উষ্ট্রীর যুদ্ধের দিন মুসলিমদের মাঝে ঐক্য প্রতিষ্ঠার পর ইবনে সাবা ও তার অনুসারীরা পুনরায় যুদ্ধ বাঁধিয়ে দেয়।

আব্দুল্লাহ ইবনে সাবা আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করে, যেরূপ সীমালঙ্ঘন করেছিল কট্টর ইয়াহূদী বুলিস[1] (পল) ঈসা 'আলাইহিস সালাম সম্পর্কে, উদাহরণত:

১. ইবনে সাবা দাবি করে বর্তমান কুরআন প্রকৃত কুরআনের এক নবমাংশ, আলী ব্যতীত কেউ পূর্ণ কুরআন জমা করতে সক্ষম হয়নি। আলী ও তার পরিবারকে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাতেনি ইলম দ্বারা ভূষিত করেছেন।

আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু ইবনে সাবাকে প্রত্যাখ্যান করে বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে কোনো ইলম দ্বারা খাস করেন নি। তিনি মিম্বারের দাঁড়িয়ে এ ঘোষণা দেন, যেমন ইমাম আহমদ ও বুখারি সহি সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

---

[1] এ কিতাবের নাসারা অধ্যায় দেখুন।

তিনি ইবনে সাবাকে ডেকে পাঠান এবং বলেন: “আল্লাহর কসম তিনি—অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম—আমাকে একান্তে কিছু প্রদান করেন নি যা অন্যান্য মানুষ থেকে গোপন করেছেন। আমি তাকে বলতে শুনেছি: কিয়ামতের পূর্বে ত্রিশ জন মিথ্যাবাদী হবে, তুমি অবশ্যই তাদের একজন”।

২. আলী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর উলুহিয়াত মতবাদ প্রকাশ করে:

ইবনে সাবা এ কুফরি আবিষ্কার করে তার অনুসারীদের মাঝে ছড়িয়ে দেয়, তাদের একদল আলী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর দরজায় এসে বলে: আপনিই সে? তিনি বলেন: সে মানে? তারা বলল: আপনি আল্লাহ। তিনি তাদেরকে তিন দিন সময় দেন, অতঃপর তাদেরকে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মারেন।

৩. ইবনে সাবা শায়খাইন তথা আবু বকর ও ওমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমাকে গালমন্দ করার উক্তি প্রকাশ করে, সে ধারণা করে আলী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু তাদের সাথে শত্রুতা পোষণ করেন। যখন আলী পর্যন্ত এ কথা পৌঁছে, তিনি বলেন: “আমার সাথে ও এ কালো খবিসের সম্পর্ক কি? আল্লাহর নিকট পানাহ চাই, তাদের ব্যাপারে ভালো ব্যতীত খারাপ কিছু গোপন করা থেকে”। অতঃপর আব্দুল্লাহ ইবনে সাবাকে মাদায়েন নির্বাসনে পাঠানোর নির্দেশ দেন এবং বলেন: “আমার সাথে এক শহরে সে কখনো থাকতে পারে না”। অতঃপর তিনি মিম্বারে দাঁড়ান, যখন মানুষেরা জড়ো হল, তিনি আবু

বকর ও ওমরের অনেক প্রশংসা করেন, এবং জনগণকে শাসিয়ে তিনি এ বলে ভাষণ সমাপ্ত করেন: "জেনে রেখো, যার সম্পর্কে পৌঁছবে যে, সে আমাকে তাদের উপর প্রাধান্য দেয় আমি অবশ্যই তাকে অপবাদের দোররা মারব"।

এ তথ্য স্মরণ রাখুন, দ্বিতীয়ত আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু ইবনে সাবাকে হত্যা করার ইচ্ছা করেন, কিন্তু তিনি নিজের বাহিনীতে ফেতনার আশঙ্কা করলেন, কারণ ইবনে সাবার অনুসারীরা তার দলে ঘাপটি মেরে ছিল, তাই তাকে নির্বাসনে পাঠিয়ে ও দূরে নিক্ষেপ করে ক্ষান্ত হন"।

পারস্যে (ইরানে) শিয়াদের বিস্তার:

পারস্যরা একটি বড় জাতি, মুসলিমরা ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর যুগে তা জয় করে, ফলে তাদের থেকে বিভিন্ন জাতি দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করে। অনেক বীর-বাহাদুর ও আলেম উঠে তাদের থেকে আসেন। তাদের অনেক অবদান ও শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে জিহাদ ও ইলমের ময়দানে, এতদ সত্ত্বেও পারস্য ছিল অনেক বাতিল ফেরকার জন্ম ও চর্চা কেন্দ্র, সেসব বাতিল ফেরকাসমূহের একটি হচ্ছে আমাদের বর্তমান আলোচনার বিষয় সীমালঙ্ঘনকারী শিয়া ফেরকা:

সেটা হচ্ছে এই যে, শাস্তিস্বরূপ আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু ইবনে সাবাকে মাদায়েন নির্বাসনে পাঠান, কিন্তু খবিস ইয়াহূদীর নফস

থেকে নাপাকি দূর করার জন্য এ শাস্তি যথেষ্ট হয়নি, বরং ঐ অঞ্চলে তার গোমরাহি ও বিষ ছড়ানোর জন্য এটাকে সে সুবর্ণ সুযোগ মনে করে। কয়েকটি কারণে সেখানে সে গ্রহণযোগ্যতা ও অনুকূল পরিবেশ পায়:

১. ইরান (পারস্য) ছিল ইসলামে প্রবেশকারী নতুন অনারব দেশ, তাতে বসবাসকারী সাধারণ লোকদের অন্তর সাবেক আকিদার ভ্রান্তি থেকে তখনো পুরোপুরি মুক্ত হয়নি, তারা যে কোনো দাওয়াত পরিপালন ও তা গ্রহণ করার জন্য উৎসুক ছিল।

২. পারস্যের কতক ব্যক্তি—বিশেষ করে ক্ষমতাধর ও সম্পদশালীরা—ইসলাম ও তার অনুসারীদের ব্যাপারে হিংসা লালন করত, কারণ ইসলাম তাদের রাজতন্ত্রের পতন ঘটিয়েছে, তাদের ঐতিহ্য ধ্বংস করেছে ও তাদের অগ্নিপূজার ধর্ম নিশ্চিহ্ন করেছে। তাদের পক্ষে ইসলামকে মুখোমুখি মোকাবিলা করা সম্ভব ছিল না, তাই ভেতর থেকে তারা ইসলামকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র ও গোপন পরিকল্পনা গ্রহণ করে।

এখানে আমরা স্মরণ করিয়ে দেই যে, পারস্যদের মাঝে ইয়াহূদীরা গুরুত্বপূর্ণ এক জাতি ছিল।

৩. পারস্যের জনগণের স্বভাব ছিল শাসক পরিবারকে নিষ্পাপ জানা, প্রভুর স্তরে তাদের আনুগত্য প্রদান করা, শাসক পরিবার থেকে পরম্পরায় রাজত্বের মালিক বানানো, এমন কি তাতে পুরুষ সদস্য

না থাকলে নারীই রাজত্বের মালিক হত। তারা শাসক পরিবারের বাইরে কাউকে রাজা হিসেবে গ্রহণ করত না, দেশ পরিচালনায় তার দক্ষতা, রাজনীতি ও নেতৃত্বে তার পারঙ্গমতা যা-ই থাক, যেমন রুস্তম ও তার ন্যায় মহান ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে তারা কিসরার মেয়েকে গ্রহণ করেছিল।

এ তিনটি নীতির উপর: অর্থাৎ ইসলাম সম্পর্কে মূর্খতা, বিদ্বেষ ও শাসক পরিবারকে সীমালঙ্ঘন পর্যায়ে সম্মান ও নিষ্পাপ জানার উপর আব্দুল্লাহ ইবনে সাবা শিয়া ফেরকার অধিকাংশ আকিদা তৈরি করে, নিম্নে তার বর্ণনা দেখুন:

শিয়াদের আকিদায় এ তিন নীতির প্রভাব:

১. ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতা ও অগ্নিপূজকদের ধ্বংসাবশেষ থেকে শিয়াদের আকিদায়: 'হুলুল' বিশ্বাসের জন্ম হয়, অর্থাৎ আল্লাহ তার কোনো মখলুকের মধ্যে প্রবিষ্ট হন। অথচ আল্লাহ তাদের কুসংস্কার থেকে কতই না পবিত্র!

আব্দুল্লাহ ইবনে সাবা 'হুলুল' আকিদা আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু সম্পর্কে রচনা করে তার ব্যাপক প্রচার করে, এমন কি যখন তার নিকট আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর হত্যার সংবাদ পৌঁছে, সে বলে: "যদি তোমরা একটি থলিতে তার মগজ নিয়ে আস আমি তার মৃত্যু বিশ্বাস করব না"। সে আরো বলে: "হত্যাকৃত ব্যক্তি আলী নয়, বরং শয়তান তার আকৃতি ধারণ করেছে, আলী আসমানে উঠে গেছে, সে

মেঘে হাঁটে, বিদ্যুৎ চমক তার দোররা, মেঘের গর্জন তার আওয়াজ। অতিসত্বর সে জমিনে ফিরে আসবে, অতঃপর তা ইনসাফ দ্বারা ভরে দিবে, যেমন তা ফাসাদ দ্বারা পূর্ণ হয়ে গেছে"। অধিকন্তু শিয়াদের মাঝে অগ্নিপূজকদের প্রতীক এখনো বিদ্যমান, যেমন নওরোজ (নববর্ষ) উৎসব পালন করা।

২. অগ্নিপূজকদের হিংসাকে পুঁজি করে ইবনে সাবা তার অনুসারী পারস্যদের মাঝে সাহাবিদের বিদ্বেষ ও গালমন্দ করার বীজ বপন করতে সক্ষম হয়, বিশেষ করে আমিরুল মুমেনিন ওমর ইবনুল খাত্তাব সম্পর্কে, যার মুজাহিদ বাহিনী তাদের দেশ জয় ও তাদের রাজত্ব ধ্বংস করেছে। তাদের এক অগ্নিপূজক আবু লুলু ওমরকে অতর্কিত হামলা করে শহীদ করে, যা সবার জানা।

এভাবে ইবনে সাবা যে ফেতনার উদ্ভব ঘটিয়েছে তা পূর্ণ করে ছাড়ে এবং উসমান, তালহা, যুবায়ের ও অনেক সাহাবিকে হত্যা করে, আর এভাবেই শিয়াদের মূলনীতিতে পরিণত হয়েছে সাহাবিদের কাফের বলা, প্রকাশ্যভাবে তাদের সাথে শত্রুতা পোষণ করা ও তাদেরকে লা'নত করা।

সবচেয়ে অবাক কাণ্ড, ইসলামের দাবি করে অগ্নিপূজক আবু লুলুর কর্মে গর্ব করা, তাকে সম্মান জানানো ও তাকে বীর-বাহাদুর উপাধি দেয়া, কীভাবে তা করা যায়[1]!!!

৩. ক্ষমতার অধিকারী ও সম্মানিত ব্যক্তিদের ব্যাপারে পারস্যদের সীমালঙ্ঘনকে পুঁজি করে ইবনে সাবা তাদের মাঝে আলীকে ইলাহ বানানোর বিদ‘আত এবং তার ও তার পরিবারের খিলাফতের হকদারিত্ব প্রচার করার সুযোগ পায়। তারা ইমামদের সম্মানে এতটা সীমালঙ্ঘন করেছে যে, নবী ও মালায়েকাদের মর্যাদার উপরে তুলেছে তাদেরকে, বরং তাদেরকে আল্লাহর সিফাতে ভূষিত করেছে, যেমন তারা বলে: “নিশ্চয় অস্তিত্বশীল প্রতিটি বস্তু ইমামদের অধীনতা স্বীকার করে এবং তারা ভুল, গাফলতি ও বিচ্যুতি থেকে পবিত্র।” পারস্য-সম্রাট কিসরার রীতি মোতাবেক খিলাফতকে তারা আল্লাহ প্রদত্ত অধিকার এবং আলী ও তার সন্তানদের জন্য সংরক্ষিত বলে। তাদের নিকট খিলাফত দীনের একটি রুকন ও মৌলিক নীতি, তবে সকল আহলে বাইতের বিপরীতে হুসাইন ও তার সন্তানদেরকে তারা খিলাফতের বেশি হকদার মনে করে, কারণ তিনি তাদের বাদশাহ কিসরার মেয়ে বিয়ে করেছেন, তাদের সকল ইমাম তার (কিসরার মেয়ের) বংশ থেকে।

[1] অথচ এটাই শিয়াদের সবাই করে থাকে। [সম্পাদক]

৪. শিয়াদের মাঝে ইয়াহূদীদের নির্দশন সুস্পষ্ট, তাদের যেসব আকিদা ইবনে সাবা শিয়াদের মাঝে দাখিল করে ও পূর্ণতা দেয়, তা নিম্নরূপ:

ক. তামসীল ও তাশবীহ: শিয়াদের পূর্বপুরুষরা তামসীল (আল্লাহর জন্য সাদৃশ্য স্থাপন) ও তাশবীহ (আল্লাহর জন্য উপমা দেওয়ার) আকিদায় বিশ্বাসী ছিল, পরবর্তীতে তারা মু'তাযিলাদের সাথে একাত্ম হয়, যেমন আমরা পূর্বে বলেছি, এভাবে তারা আল্লাহর গুণাবলি অস্বীকারকারী মু'আত্তিলা ফেরকায় পরিণত হয়।

খ. ইয়াহূদীরা বিশ্বাস করে, শেষ জামানায় একজন মসীহ ইয়াহূদী আসবেন, তিনি পুরো দুনিয়া দাউদের শরীয়ত দ্বারা ফয়সালা করবেন, তার সাহায্যকারী হবেন মূসা ও ইউসা ইবনে নুনের সাথীগণ। আর শিয়াদের আকিদায় রয়েছে, তাদের প্রতিশ্রুত মাহদি দাউদের শরীয়ত দ্বারা ফয়সালা করবেন, তার সাথে অনেক সাহায্যকারী প্রেরণ করা হবে, তারা হবে মূসা ও ইউসা ইবনে নুনের সাথী।

গ. ইয়াহূদীরা বিশ্বাস করে, আল্লাহর পক্ষে আল-বাদা (অর্থাৎ ভুল হওয়া) সম্ভব, এ কথার অর্থ আল্লাহ কোনো বিষয়ে নির্দেশ করেন, অতঃপর তার ভুল স্পষ্ট হয়, ফলে তিনি তার বিপরীত নির্দেশ করেন। অথচ আল্লাহ এ থেকে পবিত্র। এ হচ্ছে আল্লাহ সম্পর্কে শিয়াদের আকিদার একটি অংশ।

শিয়াদের গুরুত্বপূর্ণ আকিদা:

শিয়ারা বিভিন্ন দল ও উপদলে বিভক্ত হয়েছে, এসব ফেরকা থেকে সবচেয়ে বড় ফেরকা হচ্ছে শিয়া দ্বাদশ ইমামিয়া। যখন শিয়া অথবা রাফিদা বলা হয় তখন তারাই উদ্দেশ্য।

আর তাদের গুরুত্বপূর্ণ আকিদা হচ্ছে:

১. ইমামত (খিলাফত) দীনের রুকনসমূহ থেকে একটি রুকন, নবীর উপর ওয়াজিব তার পরবর্তী খলিফা নির্ধারণ করা।

২. নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পরবর্তী খলিফা আলীকে নির্দিষ্ট করেছেন, এ সম্পর্কে কুরআনের অনেক আয়াত নাযিল হয়েছে, কিন্তু সাহাবিরা তা একযোগে গোপন করে ও তার বিরোধিতা করে। আবু বকর, ওমর ও উসমান খিলাফত ছিনতাই করে, তাই সাহাবিরা কুফরি করে ও ইসলাম থেকে বের হয়ে যায়, তবে অল্প সংখ্যক ব্যতীত।

৩. ইমামরা ভুল, গাফলতি, বিস্মৃতি ও ত্রুটি থেকে মুক্ত, তারা সরাসরি আল্লাহর থেকে ইলম গ্রহণ করেন, কি হয়েছে ও কি হবে তারা জানেন। অস্তিত্বশীল প্রত্যেক অণু তাদের বশ্যতা স্বীকার করে, তারা জানেন কখন মারা যাবেন, তারা স্বীয় ইচ্ছা ব্যতীত মারা যান

না। তাদেরকে আহ্বান করা, তাদের নিকট ফরিয়াদ করা এবং তাদের দাসত্ব ধারণ করে নামকরণ করা বৈধ।[1]

৪. ইমামের সংখ্যা বারোজন, প্রথম ইমাম: আলী, অতঃপর হাসান, অতঃপর হুসাইন, অতঃপর আলী ইবনে হুসাইন (জয়নুল আবেদীন), যার মা কিসরার মেয়ে, অতঃপর ইমামদের পরম্পরা তার সন্তানদের ভেতর চলমান থাকে কাল্পনিক দ্বাদশ ইমাম মুহাম্মদ ইবনে হাসান আসকারি পর্যন্ত, যার সম্পর্কে তারা বিশ্বাস করে, তিনি সামুররা নামক স্থানে ২৬১হি. গুহায় আত্মগোপন করেন। অতিসত্বর তিনি শেষ জমানায় বের হবেন এবং মানুষের মাঝে দাউদের বিধানে ফয়সালা করবেন। তিনি আলী ও তার অনুসারীদের শত্রুদের জীবিত করার নির্দেশ দিবেন, তন্মধ্যে প্রথম ব্যক্তি আবুবকর অতঃপর ওমর, অতঃপর অন্যান্য সাহাবি ও খলিফাগণ, অতঃপর তার বের হওয়ার সময় পর্যন্ত সকল মুসলিম খলিফা, এদের সবাইকে তিনি পুনরায় হত্যা করবেন।

৫. কুরআনুল কারিমে বিকৃতি ও হ্রাস রয়েছে, যার স্রষ্টা সাহাবিরা, আলীর মুসহাফ পরিপূর্ণ মুসহাফ, যার উত্তরাধিকারী হন দ্বাদশ ইমাম, তিনি তা নিয়ে গুহায় প্রবেশ করেন, যা বর্তমান কুরআন অপেক্ষা

---

[1] যেমন: আব্দুল হুসাইন, আব্দুর রিদা, আব্দুল কাযিম ও আব্দুল আমীর।

তিনগুণ। তাতে আহলে সুন্নাদের কুরআনুল কারিমের এক হরফও নেই।

এ কুরআনের অপর নাম: মুসহাফে ফাতিমা, তাদের মুজতাহিদরা আহলে বাইতের ইমামদের সম্পর্কে রচনা করা মিথ্যা ও বানোয়াট বর্ণনা দ্বারা এ কুরআন তৈরি করার প্রচেষ্টা চালায়।

কিন্তু তারা তাদের ইমামদের থেকে আমাদের কুরআন পড়া, তার ভিত্তিতে ইবাদত ও আমল আঞ্জাম দেওয়ার নির্দেশ বর্ণনা করে, যতক্ষণ না সত্যিকার ইমাম প্রকৃত কুরআন নিয়ে আসবেন।

৬. বিশ্বাস করা যে, কুরআন সৃষ্ট ও মখলুক।

৭. আল্লাহর সিফাৎ ও তাকদীর অস্বীকার করা।

সারকথা, মৌলিকভাবে আকিদার ক্ষেত্রে তারা মু'তাযিলা ফেরকার অনুসারী, কিন্তু 'আল-বাদা' মতবাদের কারণে তারা তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন।

৮. শিয়াদের নিকট সুন্নাহ:

শিয়ারা সুন্নিদের প্রসিদ্ধ কিতাব স্বীকার করে না, যেমন সহি বুখারি, সহি মুসলিম, মুসনাদে ইমাম আহমদ ও অন্যান্য সুনান গ্রন্থসমূহ। তাদের নিকট সুন্নত তা-ই যা আহলে বাইতের সূত্রে পৌঁছেছে। তাদের দৃষ্টিতে নিষ্পাপ ইমামদের থেকে বর্ণিত বিষয়ে তারা সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করে।

মূলনীতিতে তারা যেরূপ আহলে সুন্নার বিরোধিতা করে, ফিকহি অনেক মাসাআলার ক্ষেত্রেও তাদের বিরোধিতা করে।

তন্মধ্যে: তাদের নিকট জিহাদ ও জুমা ওয়াজিব নয়, যতক্ষণ না আত্মগোপনে থাকা ইমাম বের হবেন। যখন তিনি বের হবেন বিশেষ ইলম প্রচার করবেন—তাদের ধারণায়—, তারা যার নামকরণ করে (ইলমে জফর), তাতে আছে ফিকহ, আহকাম ও পূর্ণ কুরআন।

এ আকিদা প্রমাণ করে শিয়া মাযহাব রচনাকারীদের উদ্দেশ্য ছিল শরীয়ত বাতিল করা এবং শরীয়তকে এমন বস্তুর সাথে সম্পৃক্ত করা যা কখনো অস্তিত্বে আসবে না, এটা সবচেয়ে ঘৃণিত ষড়যন্ত্র।

মু'তাযিলা

পূর্বে ইশারা করা হয়েছে যে, মু'তাযিলা ফেরকার প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছে ওয়াসিল ইবনে আতা ও আমর ইবনে উবাইদ। তাদের উভয়কে হাসান বসরি রাহিমাহুল্লাহ কুফার মসজিদে স্বীয় হালাকা থেকে বের করে দিয়ে ছিলেন। মু'তাযিলা ফেরকার প্রথম বিদ'আত ছিল ঈমান সংক্রান্ত, কারণ তারা বলে: কবিরা গুনাকারী মুমিনও নয়, কাফিরও নয়, কিন্তু সে দুই স্তরের মধ্যবর্তী স্তরে।

তারা তাকদীর অস্বীকার করার ক্ষেত্রে মা'বাদ জুহানি ও গায়লানের সাথে ঐকমত্য পোষণ করে, অতঃপর তার সাথে যোগ করে আল্লাহর সিফাৎ অস্বীকার করা ও সাহাবিদের ছিদ্রান্বেষণ করা—আল্লাহ সাহাবীগণের উপর সন্তুষ্ট হোন—।

মু'তাযিলাদের মাযহাবের ক্রমোন্নতি:

মু'তাযিলাদের মাযহাব হিজরি দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষে চিন্তা ভিত্তিক স্বতন্ত্র মতবাদের রূপ গ্রহণ করে, দুটি কারণে:

১. গ্রীক দর্শনের কিতাবসমূহের অনুবাদ, তার উপর মু'তাযিলাদের গভীর মনোযোগ প্রদান, তার পঠন-পাঠনে গুরুত্বারোপ ও তার নীতি

থেকে ইলমে কালামের[1] ভিত রচনা করা, ইত্যাদি কারণে তাদের মাযহাব স্বতন্ত্র রূপ ধারণ করে।

২. মু'তাযিলাদের বড় এক সংখ্যক লোক ওয়াসিল ইবনে আতা ও আমর ইবনে উবাইদের ছাত্রদের নিকট শিষ্যত্ব গ্রহণ করা, তন্মধ্যে মশহুর হচ্ছে আবুল হুযাইল আল-'আল্লাফ ও ইবরাহীম আন-নাযযাম।

তাদের উভয়ে মুসলিম উম্মাহর ঐকমত্যের বিপরীত বেশ কিছু কুফরি মতবাদ চালু করে, একই সময় তারা একে অপরকে প্রত্যাখ্যান করে ও কাফের বলে। বিদ'আতিদের অবস্থা সর্বদা এরূপই হয়। সত্যিকথা হচ্ছে তাদের দু'জনের জীবনী যে অনুসন্ধান করবে, সে তাদের মধ্যে নিন্দিত চরিত্র, ভ্রান্ত বিশ্বাস ও আল্লাহর উপর স্পর্ধা দেখানোর ধৃষ্টতা দেখতে পাবে, যা তাকে বিশ্বাসী করে তুলবে তাদের নাস্তিকতা ও বদ্বীনি সম্পর্কে, ঐতিহাসিকগণ যা তাদের সম্পর্কে বলেছেন।

মু'তাযিলা ও কুরআনকে মখলুক বলার ফিতনা:

মু'তাযিলারা ফিতনা সৃষ্টি ও উম্মতকে কঠিন মুসিবত দ্বারা পরীক্ষায় ফেলার মূল কারণ; লৌহদণ্ড বা ক্ষমতার জোরে ও জেল-জুলুমের

[1] ইলমে কালামের বর্ণনা সামনে আসছে।

মাধ্যমে তারা উম্মতকে এটা বিশ্বাস করাতে বাধ্য করায় যে, কুরআন—যা আল্লাহর কালাম— তা মখলুক বা সৃষ্ট।

তারা এ মতবাদকে খলিফা মামুনের নিকট সুসজ্জিত করে পেশ করে, অতঃপর খলিফা মুতাসিমের নিকট, যে ইমাম আহমদ ও অন্যদের শাস্তি দেয়, যেন তিনি অত্র গোমরাহিতে তাদের সাথে ঐকমত্য পোষণ করেন[1]।

মু‘তাযিলাদের দলসমূহ:

মু‘তাযিলারা বিভিন্ন ফেরকায় বিভক্ত হয়েছে, তার এক ফেরকা অপর ফেরকাকে কাফির অথবা গোমরাহ বলে। তৃতীয় শতাব্দী থেকে মু‘তাযিলা ও শিয়া এক হয়। রাফেদী ও যাইদিয়ারা অদ্যাবধি মু‘তাযিলাদের আকিদার উপর বিদ্যমান।

অনুরূপ মু‘তাযিলাদের দ্বারা প্রভাবিত হয় আশ‘আরি মাযহাব, পরবর্তী যে আশ‘আরী মতবাদ সবচেয়ে বেশি প্রচার-প্রসার পায়।

আধুনিক তুলনামূলক গবেষণায় প্রমাণিত, মু‘তাযিলাদের মতবাদ মূলত পুরনো মূর্তিপূজক গ্রীক দর্শনের প্রতিস্থাপন। এ কথাই আহলে সুন্নাহর আলেমগণ অনেক আগে বলেছেন।

[1] কিন্তু ইমাম আহমাদ তাদের সাথে ঐকমত্য পোষণ করেন নি। বরং পর্বতের ন্যায় এর বিপরীত সহীহ আকীদা-বিশ্বাস নিয়ে একাই দাঁড়িয়ে ছিলেন। আর তা হচ্ছে কুরআন আল্লাহর বাণী, যা আল্লাহর একটি গুণ। [সম্পাদক]

এসব কারণে দিনদিন মানুষ আহলে-সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের দিকে ঝোঁকছে, আর তাই সকল প্রশংসা আল্লাহর।

মু'তাযিলাদের গুরুত্বপূর্ণ আকিদা: পাঁচটি মূলনীতি:

মু'তাযিলাদের অনেক আকিদা রয়েছে, তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে পাঁচটি মূলনীতি, যার উপর তাদের সকল ফেরকা একমত, যদিও কখনো কখনো তার ব্যাখ্যায় মতবিরোধ করে, যেমন:

১. তাওহীদ: তাদের নিকট তাওহীদের উদ্দেশ্য আল্লাহ তা'আলার সিফাৎ তথা গুণাগুণ অস্বীকার করা, তারা বলে: আল্লাহ তার সত্তাগত জ্ঞানী, সত্তাগত শ্রবণকারী, সত্তাগত দ্রষ্টা, অথবা তিনি জ্ঞান ব্যতীত জ্ঞানী, শ্রবণ ব্যতীত শ্রবণকারী, চোখ ব্যতীত দ্রষ্টা... ইত্যাদি। অনুরূপ তাওহীদ দ্বারা কুরআনকে মখলুক বা সৃষ্ট বলাও তাদের উদ্দেশ্য। তাদের সংশয় হচ্ছে, আমরা যখন আল্লাহর সিফাৎ প্রমাণ করি, তখন মূলত অনেক ইলাহের অস্তিত্ব স্বীকার করি, কারণ সিফাৎ বা গুণাগুণ সত্তা বহির্ভুত বিষয়।

তাদের এ সংশয় ভিত্তিহীন, কারণ মানুষের সিফাৎ মানুষ নয়, তাহলে আল্লাহর সিফাৎ কিভাবে ইলাহ হয়, অথচ আল্লাহর জন্য রয়েছে উত্তম উদাহরণ?! সিফাৎ অস্বীকার করা মূলত আল্লাহর কিতাব ও রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতে মিথ্যারোপ করা।

২. আদল: আদল (তথা ন্যায়পরায়ণতা) দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য আল্লাহ মন্দ সৃষ্টি করেন না ও তার ইচ্ছাও করেন না। তিনি বান্দার তাকদীরে পাপ নির্ধারণ করেন নি, কিন্তু তারা নিজেরা নিজেদের কর্ম সৃষ্টি করে। যে পাপ আল্লাহ চান না এবং যা তিনি নির্ধারণ করেন নি বান্দাগণ তাই কাজে পরিণত করে।

তাকদীরের ক্ষেত্রে এটাই তাদের দর্শন, তাদের সংশয়ের মূল কারণ আল্লাহর দুই প্রকার ইচ্ছায় (আল্লাহর ইরাদাতুল কাওনিয়া ও ইরাদাতুশ শারইয়্যাতে) কোনো পার্থক্য না করা: (কারণ আল্লাহর ইচ্ছা দু' প্রকার)

ক. 'ইরাদাতুল কাউনিয়া' বা আল্লাহর সর্বব্যাপী পার্থিব ইচ্ছা, যা (কুরআন ও সুন্নায়) 'মাশীয়্যাহ' নামে খ্যাত। অর্থাৎ ব্যাপক চাওয়া। অতএব আল্লাহ যা চান ও যার অস্তিত্ব ইচ্ছা করেন করেন তা ব্যতীত জগতে কিছুই হয় না। চাই সেটা তার পছন্দনীয় বিষয় হোক বা না হোক।

খ. 'ইরাদাতুশ শারইয়্যাহ' বা আল্লাহর শরীয়তগত ইচ্ছা, যা ভালোবাসার অর্থে। অতএব আল্লাহ যা কিছু নির্দেশ করেন ও শরীয়ত হিসেবে প্রবর্তন করেন তা করা তিনি মহব্বত করেন, চাই বান্দারা তাতে তার আনগত্য করুন বা অবাধ্যতা পোষণ করুন। তবে তাদের আনুগত্য বা অবাধ্যতা আল্লাহর সার্বিক সর্বব্যাপী (ব্যাপক) ইচ্ছার বাইরে যাবে না।

মুতাযেলি যদি বলে: 'আল্লাহ কি কুফর চান'? আমরা তাকে উত্তর দিবো বিস্তারিতভাবে:

ক. যদি তোমার প্রশ্ন দ্বারা উদ্দেশ্য হয়: তিনি কুফরি চান ও কুফর নির্ধারণ করেন, তাহলে উত্তর হবে, হ্যাঁ। আমরা দেখি ও জানি কাফেরদের সংখ্যা অনেক, আল্লাহর রাজত্বে তার ইচ্ছা ব্যতীত কিছু হয় না, তার তাকদীর (অর্থাৎ নির্ধারণ) ব্যতীত কোনো বস্তু অস্তিত্ব লাভ করে না।

খ. আর যদি তোমার প্রশ্ন দ্বারা উদ্দেশ্য হয়, তিনি কুফর পছন্দ করেন, তার অনুমোদন ও নির্দেশ দেন, তাহলে উত্তর হবে: না, কারণ তিনি বলেছেন:

﴿ وَلَا يَرۡضَىٰ لِعِبَادِهِ ٱلۡكُفۡرَۖ ۞ ﴾ [الزمر: ٧]

"আর তিনি স্বীয় বান্দার জন্য কুফর পছন্দ করেন না"।[1] দ্বিতীয়ত তিনি রাসূল প্রেরণ ও কিতাব নাযিল করেছেন কুফর থেকে সতর্ক করার জন্যই।

৩. ওয়াদা ও হুশিয়ারি: মু'তাযিলাদের নিকট ওয়াদা ও সতর্ক বার্তার দাবি অনুযায়ী পাপীদের শাস্তি প্রদান করা আল্লাহর উপর ওয়াজিব, তিনি তাদের ক্ষমা করবেন না, তাদের ব্যাপারে সুপারিশ কবুল

---

[1] সূরা যুমার: (৭)

করবেন না এবং কখনো তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করবেন না।

৪. দু' স্তরের মধ্যবর্তী স্তর: অর্থাৎ এ বিশ্বাস পোষণ করা যে, কবিরা গুনাহকারী যেমন যিনাকারী ও মদ পানকারী না মুমিন না কাফির, বরং সে ঈমান ও কুফরের মধ্যবর্তী স্তরে।

৫. সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করা: এ নীতির উদ্দেশ্য, তারা যে তাওহিদ ও আদল ইত্যাদি বিশ্বাস করে, তার দিকে আহ্বান করা ও মুসলিম শাসকবর্গ যারা তাদের মতবাদের অনুসারী নয় অথবা তাদের মাযহাবের অনুসারী কিন্তু জালেম বা বিরুদ্ধাচারী তাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ করা।

তাদের সবচেয়ে বিপজ্জনক নীতি: মত ও বিবেককে বিচারক সাব্যস্ত করা এবং কুরআন ও সুন্নাহ পরিত্যাগ করা। এ নীতির ভিত্তিতে তারা বাতিল আকিদা তৈরি করেছে, যেমন কবরের আযাব, পুলসিরাত ও মীযান অস্বীকার করা, এ জাতীয় প্রমাণিত গায়েবি অনেক বিষয় তারা অস্বীকার করে।

তারা সহি হাদিসগুলো ত্যাগ করে, কারণ সেগুলো তাদের প্রবৃত্তির বিপক্ষে। সহি হাদিস তাদের মত ও পথের বিপক্ষে হলে তারা সাহাবি, তাবেঈ ও সকল রাবিকে মিথ্যাবাদী বলে।

আর যেসব আয়াত তাদের মতের বিরোধী, সেগুলোতে তারা শরীয়ত ও অভিধান ত্যাগ করে ব্যাখ্যা দেয় এবং যেভাবে চায় সেভাবে তার তাবিল ও অপব্যাখ্যা করে।

অধ্যয়নের জন্য মূলপাঠ

হাদিস সম্পর্কে মু'তাযিলাদের অভিমত:

'উসূলে খামসাহ', 'মুগনি' ও অন্যান্য গ্রন্থের প্রণেতা: কাদি আব্দুল জাব্বার হামদানি মু'তাযেলি বলেন,

"সংবাদের হয় সত্যতা জানা যাবে, অথবা মিথ্যা জানা যাবে, অথবা সত্য ও মিথ্যা কিছু জানা যাবে না..."।

তিনি বলেন: "দ্বিতীয় প্রকার, অর্থাৎ যে সংবাদের মিথ্যা জানা যায়, তা দু'প্রকার: তার মিথ্যা অবশ্যম্ভাবীভাবে জানা যাবে অথবা গবেষণার দ্বারা জানা যাবে, যদি অবশ্যম্ভাবীভাবে জানা যায় যেমন কেউ আমাদের সংবাদ দিল যে আসমান আমাদের নিচে ও জমিন আমাদের উপরে। এ জাতীয় অন্যান্য সংবাদ।

আর যেসব সংবাদের মিথ্যা গবেষণার দ্বারা জানা যায়, যেমন মুজবিরাহ ও মুশাব্বিহাদের সংবাদ, যা তারা তাদের বাতিল মাযহাব প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে বলে থাকে, যাতে রয়েছে জাবর, তাশবিহ ও তাজসীম[1] ইত্যাদি গোমরাহ চিন্তাধারা।

আর যেসব সংবাদের সত্য বা মিথ্যা জানা যায় না সেগুলো খবরে ওয়াহিদের মত এবং অনুরূপ পন্থায় প্রাপ্ত সংবাদ। সেসব খবরে

[1] মু'তাযিলারা আহলে সুন্নাহকে জাবরিয়া, মুশাব্বিহাহ ও মুজাস্সিমাহ বলে।

ওয়াহিদের উপর আমল করা বৈধ যদি তা শর্ত মোতাবেক বর্ণিত হয়, তবে ইতিকাদ বা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে তা গ্রহণযোগ্য নয়...।

তিনি বলেন: এখানে আরেকটি মূলনীতি, সেটা হচ্ছে, যেসব সংবাদ এরূপ হবে তা পরখ করা ওয়াজিব, যদি তার দাবি আমল করা হয়, তবে আমল করা হবে যদি শর্ত মোতাবেক বর্ণিত হয়। কিন্তু যদি তার দাবি আকিদা-বিষয়ক হয় তখন তাতে দেখতে হবে সেটি বিবেকী দলিল সমর্থন করে কী না, যদি সমর্থন করে তবে তা কবুল করা হবে এবং তার চাহিদা মোতাবেক বিশ্বাস স্থাপন করা হবে, তার মর্যাদার কারণে নয়, বরং বিবেকী দলিল সমর্থন করার কারণে।

আর যদি (সে সব সংবাদ) বিবেক সমর্থন না করে, তাহলে প্রত্যাখ্যান করাই ওয়াজিব এবং চূড়ান্তভাবে সিদ্ধান্ত দেওয়া হবে যে, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা বলেন নি, যদিও বলে থাকেন তবে সেটা তিনি অন্য কারো কথা বর্ণনা করেই বলেছেন। এটা তখনই বলা হবে যখন অযৌক্তিক পদ্ধতি ব্যতীত তাওয়ীল বা ব্যাখ্যার সুযোগ না থাকে, কিন্তু যদি তাওয়ীল বা ব্যাখ্যার সুযোগ থাকে তাহলে তাওয়ীল বা ব্যাখ্যা করা ওয়াজিব।[1]

[1] উসুলুল খামসাহ: (পৃ.৭৬৮-৭৭০), কায়রো, ১৯৬৫ই.

ইলমে কালাম বা কালাম শাস্ত্র

আল্লাহ তা'আলা নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নূর ও হিদায়েত দিয়ে প্রেরণ করেছেন এবং নাযিল করেছেন তার উপর কিতাব ও হিকমত, ফলে তিনি আহকাম ও আকিদার ক্ষেত্রে মানুষদেরকে সত্য ও সঠিক পথ বাতলে দেন। আল্লাহ তার নিকট যা ওহি করেছেন তার কোনো বস্তু তিনি গোপন করেন নি । তিনি ততক্ষণ সর্বোত্তম বন্ধুর সাথে মিলিত হননি যতক্ষণ না উম্মতকে পরিষ্কার পথের উপর রেখেছেন, যার থেকে ধ্বংসপ্রাপ্ত ব্যতীত কেউ বিচ্যুত হয় না ।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দীনের মৌলিক ও আনুষঙ্গিক প্রত্যেক বিষয় সাহাবিদের শিক্ষা দিয়েছেন এবং তারাও তার থেকে প্রত্যেক বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করেছেন। এমন কোনো গোমরাহি ও সংশয় নেই, যা খণ্ডন ও নিরসন করার দলিল কুরআন ও হাদিসে নেই, তবে যে জানে সে জানে, যে জানে না সে জানে না।

সবচেয়ে মহান যে ইলম নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে শিক্ষা দেন ও তাদের নিকট পৌঁছান এবং উম্মত যে মহান ইলম অর্জন করা ও শিখানোর জন্য বেশি আগ্রহী ছিল সেটা হচ্ছে নাম ও সিফাতসহ আল্লাহর তা'আলার পরিচয় এবং বান্দার উপর অপরিহার্য তাওহীদ ও আনুগত্যের ইলম। অতঃপর অন্যান্য গায়েবি

বিষয়ের উপর গুরুত্বারোপ করেন মানুষ যা স্বীয় বিবেক দ্বারা জানতে পারে না, এমনকি সেটা পর্যন্ত তাদের - ইলম পৌঁছতে সক্ষমও নয় আর ওহি ব্যতীত সেটার বিষয়ে সত্য জানার সুযোগও নেই।

কিন্তু ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত কতক লোক সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায় এবং সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ না করে অন্য পথে সত্যান্বেষণ করতে শুরু করে। তাদের কেউ কেউ এমন আছে যাদেরকে কুরআন ও হাদিসের জ্ঞান তুষ্ট হতে পারে নি, আবার কেউ কেউ এমন আছে যে তার রব সংক্রান্ত আকিদা কুরআন ও সুন্নাহ ব্যতীত অন্যান্য উৎস থেকে গ্রহণ করা শুরু করে, আবার কেউ কেউ এমন আছে যে পুরনো দর্শন ও বিলুপ্তপ্রায় ধর্মের ফিতনায় নিমজ্জিত হয়ে পড়ে, যদিও তার উদ্দেশ্য ছিল ঐসব বিলুপ্তপ্রায় ধর্মের অনুসারী ও দার্শনিকদের সাথে তর্ক করা ও ইসলামের পক্ষে প্রতিরোধ করা, তবে কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশিত পদ্ধতি ব্যতীত, তাই সে বিবেক দ্বারা তর্কে লিপ্ত হয়, প্রবৃত্তি দ্বারা প্রতিহত করতে শুরু করে এবং , দীনের এক অংশকে সাব্যস্ত করতে গিয়ে অপর অংশকে পরিত্যাগ করে বসে, কিছু বিষয়কে সপ্রমাণ করতে গিয়ে অপর বিষয়কে অস্বীকার করে বসে।

অধিকন্তু বিদ‘আতি ও বাতিল ফেরকার অনুসারীরা তাদের বিদ‘আত ও মতবাদকে শক্তিশালী করার জন্য এসব দর্শনকে মাধ্যম হিসেবে খুঁজে পায়।

ইলমে কালামে গ্রীক দর্শনের প্রভাব:

পৌত্তলিক গ্রীক দর্শন রোমসম্রাজ্য ও তার অনুগত অঙ্গরাজ্যে প্রচলিত ছিল, যেমন শাম ও মিসর। মুসলিমরা এসব দেশ জয় করে ও তার অধিবাসীরা ইসলামে দীক্ষিত হয়, তবে তাদের কারো নিকট গ্রীক দর্শনের ধ্বংসাবশেষ থেকে যায় জ্ঞাত কিংবা অজ্ঞাতসারে।

গ্রীক দর্শন নানামুখী, তবে তার প্রত্যেকটির নীতি হচ্ছে আল্লাহ সম্পর্কে বিনা ইলমে কথা বলা এবং যেখানে বিবেকের দখল নেই সেখানে ঘাঁটাঘাঁটি করা। গ্রীক দার্শনিকরা ছিল পৌত্তলিক, নবীদের আদর্শ থেকে বহুদূরে, যেমন প্লেটো ও এরিষ্টেটল।

গ্রীক দর্শনের ধ্বংসাবশেষ জাহেল বিদ‘আতিদের নিকট ব্যাপক সমাদৃত হয়, যেমন জা‘দ ইবনে দিরহাম, সে সর্বপ্রথম আল্লাহর সিফাৎ অস্বীকার করে এবং তার ছাত্র জাহাম ইবনে সাফওয়ান, সে জাহমিয়া ফেরকার প্রতিষ্ঠাতা এবং ওয়াসেল ইবনে আতা, সে মু‘তাযিলা ফেরকার প্রতিষ্ঠাতা।

অতঃপর মু‘তাযিলা ফেরকা আত্মপ্রকাশ করে, তারা ব্যাপকহারে গ্রীক দর্শন ও গ্রীক তর্কশাস্ত্র আমদানি করে। তারা কুরআন ও সুন্নাহ নীতি ত্যাগ করে কতক নীতিমালা তৈরি করে, যার নামকরণ করে ‘ইলমুল

কালাম’, বা কালাম শাস্ত্র, তার ভিত্তিতে তারা আকিদা উপস্থাপন করে, তার উপর ভিত্তি করেই আকিদার উপর দলিল দেয় ও তার উপর ভিত্তি করেই আকিদার পক্ষে প্রতিরোধ করে।

এরপর মামুন যখন খলিফা হয়, তখন সে অনুবাদ সংস্থা প্রতিষ্ঠা করে এবং দর্শন শাস্ত্রের অনেক কিতাব আমদানি করে। সে নিজে ‘খালকে কুরআন’ নামক বিদ‘আতি মতবাদে বিশ্বাসী হয়। মু‘তাযিলা ও অন্যান্য ফেরকার লোকদের তার নৈকট্য দেয়, এভাবে ফিতনা বিরাট আকার ধারণ করে ও দীনের ব্যাপারে বাদানুবাদ বৃদ্ধি পায়। তখন থেকে ‘ইলমে কালামে’র বিদ‘আত বৃদ্ধি পায়, অন্যান্য ইলমে তা প্রবেশ করে, অবশেষে পরবর্তীকালে ইলমে কালামকে ‘ইলমে তাওহীদ’ নামকরণ করা হয়!

অবশ্য আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আত তাদের বিরুদ্ধে যর্থার্থ অবস্থান গ্রহণ করে, আর তাদের সেসব মূলনীতি ও কায়েদাগুলোকে যিনি সবচেয়ে বেশি চূর্ণ-বিচূর্ণ ও বিনষ্ট করে দেন তিনি হচ্ছেন শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ। বেশি বর্তমান যুগে ইলমে কালাম দু’টি গুরুত্বপূর্ণ কারণে ধ্বংসোন্মুখ হয়ে পড়েছে:

এক. সে দর্শন শাস্ত্রের পতন, যার উপর গ্রীক দর্শনের মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, কারণ আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান গ্রীক দর্শন যেসব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তার অধিকাংশ বাতিল প্রমাণ করে, খোদ

পাশ্চাত্যের লোকেরা পর্যন্ত ইতিহাস চর্চার প্রয়োজন ব্যতীত প্লেটো ও এরিষ্টেটলকে স্মরণ করছে না।

দুই. বর্তমান যুগে ইসলামের পুনর্জাগরণ, যার অধিকাংশ লোক সালাফি চিন্তাকে ধারণ করেছে।

এতদসত্ত্বেও মুসলিম অধ্যুষিত বিভিন্ন দেশের গতানুগতিক কতিপয় সংস্থা-প্রতিষ্ঠান ইলমুল কালাম বা কালাম শাস্ত্রের আদর্শকে আঁকড়ে থেকে তার পঠন-পাঠনে অনড় রয়েছে।

ইলমে কালামের উদ্দেশ্য:

ইলমে কালামের ধারকরা ইলমে কালামের সংজ্ঞায় বলেন: 'ইলমে কালাম এমন এক ইলম, যার দ্বারা ব্যক্তি দলিল উপস্থাপন ও সন্দেহ দূর করে দীনি আকিদাকে অপরের উপর বিজয়ী করতে সমর্থ হয়"। এ সংজ্ঞাতে তারা তাদের তথাকথিত উদ্দেশ্যের বর্ণনা দিয়েছে, আর তা হচ্ছে, বিবেক ও যুক্তির মাধ্যমে আকিদা প্রমাণ ও তার পক্ষে প্রতিরোধ করা।

এ উদ্দেশ্যে তারা গ্রীক দর্শন ও মানতেক (তর্কশাস্ত্র) শিখে এবং বিতর্ক ও বাদানুবাদে তাদের পদ্ধতি অনুসরণ করে। তাদের ধারণা, নাস্তিকদের সন্দেহ ও অস্বীকারকারীদের তুষ্ট করার এটাই সঠিক পদ্ধতি।

সত্যি কথা হচ্ছে, তাদের অনেকের উদ্দেশ্য এটাই ছিল যদি তাদের কর্ম ও নীতির বিশুদ্ধতার প্রশ্ন ত্যাগও করি, কিন্তু তাদের অনেকে

খোদ নাস্তিক ছিল, কিন্তু মুসলিম সমাজে সন্দেহের বিস্তার ও মুসলিমদের আকিদা নড়বড়ে করার জন্য সে এ ইলম অর্থাৎ ইলমুল কালাম বা কালাম শাস্ত্রকে আড়াল হিসেবে গ্রহণ করে।

পূর্বসূরি আলেমগণের নিকট ইলমে কালাম ও তার ধারকদের বিধান:

সালাফ বা আদর্শ পূর্বসূরিদের নিকট ইলমে কালাম বিদ'আতি ইলম, তা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করা বৈধ নয় খণ্ডন করার উদ্দেশ্য ব্যতীত। ইলমে কালাম শুধু এ কারণে বিদ'আত নয় যে, এটা নতুন ইলম ও নতুন পরিভাষা, বরং এর বিদ'আত হওয়ার কারণ হচ্ছে, এটি আকিদা উপস্থাপন ও তার পক্ষ থেকে প্রতরোধ করার ক্ষেত্রে কুরআন ও সুন্নাহর নীতি-আদর্শ স্পষ্টভাবে বিরোধিতা করেছে।, অতিশীঘ্র যা আমরা স্পষ্ট করবো।

এ জন্য ইসলামের ইমামগণ যেমন: আবু হানিফা, মালিক, শাফে'ঈ, আহমদ ইবনে হাম্বল, ইবনে মুবারক ও বুখারি প্রমুখ আলেমগণ ইলমে কালামের ধারকদের প্রত্যাখ্যান, তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন ও তাদের থেকে মানুষদের সতর্ক করার ক্ষেত্রে ঐকমত্য পোষণ করেছেন, যেরূপ তারা ইলমে কালামের ধারকদের বিপক্ষে বিভিন্ন হুকুম জারি করেছেন, ইলমে কালামে লিপ্ত হওয়ার তারতম্য অনুসারে। বস্তুত ইলমে কালামের ধারকরা দু'ভাবে বিভক্ত:

১. জাহমিয়াহ ও দার্শনিকগণ, যারা আল্লাহর সকল নাম ও সিফাৎ এবং অকাট্যভাবে প্রমাণিত অনেক আকিদা অস্বীকার করে, সালাফগণ তাদের উপর কুফরি ও দীন থেকে বের হয়ে যাওয়ার হুকুম জারি করেছেন।

২. তাদের চেয়ে স্বল্প আকারে কালাম শাস্ত্র লিপ্ত অপরাপর কালাম শাস্ত্রবিদগণ; সালাফে সালেহীন তাদের উপর গোমরাহি, বিদ'আত এবং সুন্নত ও সঠিক রাস্তা থেকে বিচ্যুতির হুকুম প্রদান করেছেন।

সালাফে সালেহীন কর্তক ইলমে কালামের ধারক-বাহক ও তাদের গৃহীত পদ্ধতি প্রত্যাখ্যান করার কারণ:

১. আকিদা প্রমাণিত হয় ওহি (কুরআন ও সুন্নাহ) দ্বারা, মানুষের বিবেক ও তাদের মত দ্বারা নয়, আর দীনে ইসলাম নির্ভর করে অনুসরণ ও আত্মসমর্পণের উপর। আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রমাণিত হলেই মুসলিম ইসলামের সংবাদ ও নির্দেশকে সত্য জানে ও বিশ্বাস করে, তর্ক ও বিবেকের সন্তুষ্টির প্রয়োজন নেই।

কাফির সাধারণত জেদি ও ঝগড়াটে হয়, তার সাথে যত তর্ক করা হোক, যত দলিল সে প্রত্যক্ষ করুক, তার স্বভাবের পরিবর্তন হয় না। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ وَلَوۡ فَتَحۡنَا عَلَيۡهِم بَابٗا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَظَلُّواْ فِيهِ يَعۡرُجُونَ ١٤ لَقَالُوٓاْ إِنَّمَا سُكِّرَتۡ أَبۡصَٰرُنَا بَلۡ نَحۡنُ قَوۡمٞ مَّسۡحُورُونَ ١٥ ﴾ [الحجر: ١٤، ١٥]

“আর আমি যদি তাদের জন্য আসমানের কোনো দরজা খুলে দিতাম, অতঃপর তারা তাতে আরোহণ করতে থাকত, তবুও তারা বলত, নিশ্চয় আমাদের দৃষ্টি কেড়ে নেওয়া হয়েছে, বরং আমরা তো জাদুগ্রস্ত সম্প্রদায়”।[1]

অতএব তর্ক দাওয়াতের নীতি নয়, অথচ কালামশাস্ত্রবিদরা তা-ই করে থাকে , তর্ক হচ্ছে জেদি ব্যক্তিকে দমন করার একটি পদ্ধতি মাত্র:

২. নিশ্চয় ওহি সুবিদিত ও নির্ভুল উৎস, পক্ষান্তরে গায়েবের হাকিকত জানার ক্ষেত্রে বিবেক স্বীয় অজ্ঞতা ও ত্রুটিসহ বিভিন্ন ও বিপরীতমুখী। এ জন্য দার্শনিক ও কালামশাস্ত্রবিদরা কোনো বিষয়ে যেন ঐকমত্যে পৌছুতে পারেন নি। হ্যাঁ, সেসব ক্ষেত্র ব্যতীত যাতে সকল বনি আদম সাধারণত একমত পোষণ করে থাকেন, যারা কোনো দর্শন কিংবা কালাম কোনো কিছুই বুঝে না।

এই যে ‘আল্লাফ ও তার সাথী নাযযাম, সর্বপ্রথম তারা ইলমে কালামের উপর কিতাব লিখে, প্রথম তারা উভয়ে এক ফেরকাভুক্ত ছিল যেমন পূর্বে বলা হয়েছে, তবুও প্রত্যেকে অপরকে প্রত্যাখ্যান করে ও কাফির বলে।

[1] সূরা হিজর: (১৪-১৫)

এ জন্য ইমাম আহমদ যখন একসাথে সকল ফেরকাকে দমন ও উম্মতকে একমাত্র বিশুদ্ধ উৎসের দিকে প্রত্যাবর্তন করানোর ইচ্ছা করেন, তখন তিনি মুসনাদ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তাতে তিনি প্রায় চল্লিশ হাজার হাদিস জমা করেন।

৩. কুরআন ও সুন্নাহ এমন দলিল ও অকাট্য প্রমাণাদি সমৃদ্ধ যার চেয়ে বড় কোনো দলিল ও প্রমাণ থাকতে পারে না। যার বিবেক যত বেশি শক্তিশালী ও পরিপূর্ণ সে সেসব দলিল ও প্রমাণ অধিক বুঝে ও তার থেকে অধিক বিধান আহরণ করতে সক্ষম হয়। ইসলাম শুধু কতিপয় বর্ণিত হাদিসের নাম নয় যার পশ্চাতে কোনো দলিল নেই, আর যা মানুষ শুধু অন্ধ ও গতানুগতিকভাবে বর্ণনা করেছে, যেমন কালাম শাস্ত্রবিদরা ধারণা করে থাকে!

নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার সাহাবিগণ বিভিন্ন শ্রেণির কাফির যেমন ইয়াহূদী, খৃস্টান ও মুশরিকদের সাথে কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা তর্ক করেছেন, এভাবেই তাদেরকে তারা নিশ্চুপ ও পরাজিত করেছেন, সকল যুগে আহলে সুন্নাহর আলেমগণ তার উপর চলেছেন, তারা শুধু কুরআন , সুন্নাহ ও পূর্বপুরুষদের বাণী পেশ করে বিরোধীদের নিশ্চুপ ও লাজওয়াব করেছেন, অন্য কোনো উৎসের সাহায্য ছাড়াই।

উম্মতে মুসলিমার উপর ইলমে কালামের প্রভাব:

উম্মতে মুসলিমার উপর ইলমে কালামের ক্ষতিকর প্রভাব যেরূপ অতীতে ছিল বর্তমানেও আছে, যেমন:

১. গায়েবী জগতকে উপস্থিত জগতের অনুগত করা: এ নীতিতে বিশ্বাসী তর্ক শাস্ত্রবিদ বা কালামশাস্ত্রবিদরা আল্লাহ, পরকাল ও সকল গায়েবী বিষয় সম্পর্কে তাদের তৈরি পরিভাষা ও মাপকাঠি দ্বারা আলোচনা করে, যেগুলো তারা উপস্থিত জগতের বস্তু প্রমাণ করার জন্য তৈরি করেছে, যেমন: জাওহার, 'আরদ, কাম্মিয়াহ, কাইফিয়্যাহ, হুদুস ও তাগাইয়ুর।

২. অকাট্যভাবে প্রমাণিত বিষয়ে সন্দেহ ও সংশয় ছড়ানো, যার উপর বিনা প্রশ্ন ও বিনা তর্কে ঈমান আনা জরুরি, যেমন: আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণের বিষয়টি অনুরূপভাবে জগত সৃজিত এ মর্মে দলিল পেশ করার বিষয়।

৩. স্পষ্ট বিবেক ও বিশুদ্ধ দলিলের মাঝে অযথা বিরোধ সৃষ্টি করা, যেমন: বিবেক বিরোধী দাবি করে অকাট্য বিশুদ্ধ হাদিসকে মিথ্যা বলা, আবার কখনো কখনো বানোয়াট হাদিস পেশ করে তারা বলে: এ সম্পর্কে হাদিস বর্ণিত হয়েছে, যদিও তা বিবেক বিরোধী।

৪. ঈমানি ফযিলতকে নিরস বিবেকি বিষয় ও অর্থহীন দীর্ঘ বিতর্কের রূপ দেওয়া, যার কোনো ভূমিকা নেই ঈমান বৃদ্ধি ও আখলাক পরিশুদ্ধির ক্ষেত্রে।

৫. নাস্তিক ও ইসলাম বিদ্বেষীদের জন্য ইসলামের উপর কটূক্তি করার দ্বার খুলে দেওয়া, কারণ তর্ক শাস্ত্রবিদরা ধারণা করে তারা যেসব বিষয় প্রমাণ ও সাব্যস্ত করে সেটাই ইসলাম। আর নাস্তিকরা যখন তাদের প্রমাণ করা বিষয়ের দুর্বলতা ও ভ্রান্তি দেখে এবং তার ছিদ্রান্বেষণের সুযোগ পায়, তখন তারা এসব দুর্বলতা ও ভ্রান্তি স্বয়ং ইসলামের সাথে যুক্ত করে—আল্লাহর নিকট আমরা এমন কাজ থেকে পানাহ চাই—।

৬. উম্মতকে বিভক্ত করা এবং এমন বিষয়ে মুসলিমদের মাঝে বিতর্কের দরজা উন্মুক্ত করা যার সম্পর্কে আল্লাহ কোনো প্রমাণ নাযিল করেন নি এবং যা জানার পশ্চাতে মানুষের সওয়াবও হয় না। তর্ক শাস্ত্রবিদদের প্রত্যেক দল অপর দলকে কাফির বলে, বরং কখনো ছাত্র উস্তাদকে, ছেলে পিতাকে কাফির বলে।

অধ্যয়নের জন্য মূলপাঠ

মানুষের হাকিকত নিয়ে দার্শনিকদের মতভেদ:

শায়খ আবুল হাসান আশ‘আরি বলেন, (যিনি স্বীয় যুগে কালাম শাস্ত্রবিদদের প্রধান ছিলেন, অতঃপর আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আতে ফিরে আসেন) : “মানুষের হাকিকত সম্পর্কে লোকদের মতভেদ কী?

আবুল হুযাইল বলেন: মানুষ হচ্ছে প্রকাশ্য দৃশ্যমান ব্যক্তি, যার দু’টি হাত ও দু’টি পা রয়েছে। তিনি বর্ণনা করেন, আবুল হুযাইল মানুষের চুল ও নখকে মানব সত্তার অংশ গণনা করেন না, যার উপর মানুষের নাম প্রযোজ্য হয়।

তিনি আরো বর্ণনা করেন, এক সম্প্রদায় বলেছে মানুষের শরীরই মানুষ, তার আনুষঙ্গিক অঙ্গ মানুষ নয়, তবে ন্যূনতম কোনো একটি আনুষঙ্গিক অঙ্গ ব্যতীত মানুষকে মানুষ বলা বৈধ নয়।

বিশর ইবনে মুতামির বলেন: মানুষ শরীর ও রূহ, তারা উভয় মিলে মানুষ। কার্য সম্পাদনকারী সত্তাই মানুষ, যা মূলত শরীর ও রূহ।

আবুল হুযাইল বলতেন, মানুষের শরীরের প্রত্যেক অঙ্গ পৃথকভাবে কার্য সম্পাদন করে না, আর না সে অপর অঙ্গের সাথে মিলে কার্য সম্পাদন করে, তবে তিনি বলতেন এসব অঙ্গই হচ্ছে কার্য সম্পাদনকারী।

দ্বারার ইবনে উমর বলেন: মানুষ বিভিন্ন বস্তুর সমন্বয়ে: রঙ, স্বাদ, গন্ধ, শক্তি ও এ জাতীয় অন্যান্য বস্তু। এসব বিষয় একত্র হলেই মানুষ, এগুলো ব্যতীত মানুষের কোনো জাওহার বা মৌলিক কিছু নেই।

হুসাইন আন-নাজ্জার শক্তিকে মানুষের অঙ্গ মানতে নারাজ, অধিকাংশ তর্ক শাস্ত্রবিদও তা মানতে নারাজ।

উবাদাহ ইবনে সুলাইমান বলেন: মানুষের অর্থ হচ্ছে সে বাশার বা মানব সন্তান, অতএব মানুষের যে অর্থ আদম সন্তানের একই অর্থ। আর প্রকৃত যুক্তিতে মানব সন্তান অর্থই মানুষ। সে আরো বলেছে, মানুষ বহু জাওহার ও আ'রাদ তথা মূল ও আনুষঙ্গিক বস্তুর সমন্বিত রূপ।

বারগুস বলেন: মানুষ হচ্ছে রঙ, স্বাদ, গন্ধ ও এ জাতীয় বিভিন্ন উপাদানের সমন্বিত রূপ।

যারকান বর্ণনা করেন, হিশাম ইবনে হাকাম বলেন: মানুষ দু'টি অর্থের সমন্বিত রূপ, শরীর ও রূহ। তবে শরীর মৃত, শরীর ছাড়াই রূহ বোধসম্পন্ন, ক্রিয়াশীল। আর রূহ নূরসমূহ হতে একটি নূর।

আবুবকর আল-আসাম্ম বলেন: যা দেখা যায় তাই মানুষ। মানুষ একক বস্তু তার কোনো রূহ নেই, সে একক জাওহার। সে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও দৃশ্যমান বস্তু ব্যতীত সব অস্বীকার করে।

নাযযাম বলেন: মানুষ সে তো রূহ, তবে সে রূহ শরীরে প্রবেশকৃত ও তার সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত । মানুষের প্রত্যেক অংশ রূহের প্রত্যেক অংশে বিদ্যমান, আর শরীর তার জন্য এক মুসবিত, খাঁচা ও তাকে চাপ প্রয়োগকারী।

মা'মার বলেন: মানুষ এমন এক ক্ষুদ্র অংশ, যা বিভক্ত হয় না, সে-ই জগতে পরিচালনানাকারী, প্রকাশ্য শরীর তার হাতিয়ার মাত্র, সে প্রকৃতপক্ষে কোনো স্থানে নেই, সে কোনো বস্তুকে স্পর্শ করে না এবং কোনো বস্তুও তাকে স্পর্শ করে না।

অন্যান্যরা বলেছে: মানুষ এমন একটি ক্ষুদ্র অংশ যা কখনো বিভক্ত হয় না, তবে তার পক্ষে স্পর্শ করা, পৃথক হওয়া, নড়াচড়া ও নীরব থাকা সম্ভব। সে এ শরীরের কোনো অঙ্গের অংশ এবং তাতেই সে প্রবেশকারী, তার স্থান হচ্ছে অন্তর। আর তারা (তর্কশাস্ত্রবিদরা) মানুষের উপর সকল আ'রাদ (গুণাগুণ) আরোপ হতে পারে বলে মনে করে। । এটা সালেহির কথা।

ইবনুর রাওয়ান্দি বলেন : মানুষ মূলত অন্তরে থাকে, তবে সে রূহ নয়, রূহ এ শরীরে অবস্থানকারী”।[1]

---

[1] মাকালাতুল ইসলামিয়্যিন: (৩২৯-৩৩২), তাহকিক হিলমুন রিটর, তৃতীয় প্রকাশ: ১৪০০হি.

সূফীবাদ

সূফিয়াহ صوفية শব্দটি সুফিয়া سوفيا শব্দ থেকে গৃহীত, গ্রীক ও পুরাতন হিন্দি ভাষায় তার অর্থ আল-হিকমাহ বা 'হিকমত'। এ সুফিয়া শব্দ থেকেই فيلاسوفيا ফাইলাসুফিয়া ও فيلسوف ফাইলাসূফ[1] শব্দদ্বয়ের উৎপত্তি, তার অর্থ محب الحكمة বা হিকমত প্রেয়সী বা জ্ঞান প্রেমিক, যেরূপ ثير صوفية (সির সূফিয়াহ) শব্দের অর্থ ইলাহের সাথে সম্পৃক্ত হিকমত। সূফীবাদ একাল ও সেকালের প্রসিদ্ধ এক মাযহাব।

হিন্দুরা সূফিয়াহ শব্দটি ব্রাহ্মন সন্ন্যাসী ও তাদের আধ্যাত্মিক পণ্ডিতদের জন্য ব্যবহার করে, যারা তাদের ধারণাপ্রসূত হিকমত ও মারেফাতের তালাশে বন-জঙ্গলে উলঙ্গ ঘুরে। তাদের লক্ষ্য হচ্ছে আল্লাহর সাথে একাকার হওয়া ও আল্লাহর মাঝে বিলীন হয়ে যাওয়া। অথচ আল্লাহ তাদের বিশেষণ থেকে পবিত্র।[2]

হিজরি দ্বিতীয় শতাব্দীর পূর্বে ইসলামে এ পরিভাষা—অর্থাৎ সুফিয়াহ পরিভাষা—শুনা যায় নি, সে সময়ে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন কতক ব্যক্তির জন্য এ শব্দটি ব্যবহার করা হত, যারা নবী সাল্লাল্লাহু

---

[1] এর অর্থ দার্শনিক। [সম্পাদক]

[2] দেখুন: মাউদুউল হিন্দুসিয়াহ': (পৃ.১০১)

‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার সাহাবিদের আদর্শের বিপরীত ইবাদতের ময়দানে বৈরাগ্যতা গ্রহণ করেছিল।

রাবিদের মান নির্ণয়কারী (জারহ ও তাদিলের) আলেমগণ ও বিভিন্ন ফেরকার উপর লেখকগণ তাদেরকে যিন্দিক বলতেন। তাদের কতিপয়ের ইসলামের সাথে বিন্দুমাত্র সম্পর্কে ছিল না। তারা ছিল অখ্যাত, অপরিচিত সন্ন্যাসী, জমিনে ঘুরে বেড়াত এবং গুহা ও জন-মানবহীন স্থানে বাস করত।

তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দীতে সূফীবাদ ব্যাপক বিস্তার লাভ করে, তখনো তার অনুসারীদের যিন্দিক বলা হত, এ জন্য তাদেরকে বহুবার বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়, যাদের বিচার হয় তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, জুনাইদ, নুরী, জুন্নুন মিসরি , আবার তাদের কাউকে হত্যাও করা হয়েছে যেমন হাল্লাজ।

পঞ্চম হিজরিতে আবু হামিদ আল-গাযালির প্রকাশ ঘটে (মৃ.৫০৫হি.), তিনি ইসলামি বিশ্বে সূফীবাদ বিস্তার ও তাকে ইসলামি পোশাক দান করেন।

গাযালি ছিলেন সুখ্যাতিসম্পন্ন ও প্রসিদ্ধির অধিকারী ফকীহ ও মুতাকাল্লিম বা কালাম শাস্ত্রবিদ। তিনি স্বীয় লেখনীতে ফিকহ, কালামশাস্ত্র ও তার পূর্বের সূফীদের কুসংস্কারের সংমিশ্রণ ঘটান, যেমন মুহাসিবি ও আবু তালিব মক্কী। তার সাথে নিজস্ব মত ও দর্শন

যুক্ত করেন, এভাবে তাসাউফ বিস্তার লাভ করে এবং মানুষও তা গ্রহণ করে নেয়।

তাসাউফ বিস্তারের কারণ:

তাসাউফ বিস্তারে প্রধান কারণ ছিল, সে সময় মুসলিম উম্মাহ বাতেনিদের বিদ্রোহ ও রাফেদিদের শাসনের দাপটে কোণঠাসা হয়ে পড়েছিল, আহলে সুন্নাহর আলেমগণ রাফেদি রাষ্ট্রসমূহের পক্ষ থেকে নির্যাতনের শিকার হতে থাকে, অপর দিকে সভ্যতা ও সংস্কৃতির ময়দানে মু'তাযিলা, মুতকাল্লিম বা কালামশাস্ত্রবিদ ও বাতেনিদের মোকাবিলা করতে থাকে, এ সুযোগে সূফীবাদ নিম্নশ্রেণির লোকদের মধ্যে তার থাবা বিস্তার করতে থাকে।

তার সাথে যোগ হয় প্রাচ্যের ইসলামি জগতে খৃস্টীয় হামলার আঘাত, ফলে বাতিলপন্থীদের সংখ্যা বেড়ে যায় ও সকল বাতিল ফেরকা প্রত্যেক ময়দানে পুরোদমে উজ্জীবিত হয়।

অনেকটা অনিচ্ছাকৃতভাবে তাসাউফ বিস্তারে ভূমিকা রাখে: ইলমে কালামের প্রচার, কারণ তাতে ছিল শুষ্কতা, দুর্বোধ্যতা, বিবেক ও বুদ্ধিকে বিচারক মানা ও গবেষণায় মগ্ন হওয়া, তখন মানুষেরা দেখল তাসাউফে তার থেকে নিষ্কৃতি রয়েছে, কারণ তাতে রয়েছে দার্শনিক জটিলতাহীন কাশফ, স্বপ্ন ও ইলহামের উপর নির্ভরতা... এভাবে তারা তাসাউফকে ইলমে কালাম ও তার ধারকদের থেকে মুক্তি হিসেবে গ্রহণ করে।

তাসাউফ কি শুধু মুসলিমদের মাঝে সীমাবদ্ধ?

ধর্ম ও মাযহাবের উপর গবেষণা পরিচালনাকারীগণ এ বিষয়ে একমত যে, তাসাউফ বিশ্বজনিন দর্শন ও সাধারণ মানবিক মনোবৃত্তি। যা সকল ধর্ম ও সকল জায়গায় পাওয়া যায়। উদ্দেশ্য, উপকরণ, দলেদলে ভাগ ও বিপরীতমুখী আকিদা বিবেচনায় তাসাউফের সবচেয়ে বেশি মিল হিন্দু ধর্মের সাথে।

সূফীবাদ বিভিন্ন নাম ও বিভিন্ন তরিকায় ইউরোপ, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য জায়গায় বিস্তার লাভ করেছে, এখনো করছে।

ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত তাসাউফও বিভিন্ন তরিকা ও বিপরীতমুখী বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত, পাঠকদের সুবিধার্থে আমরা তা দু'ভাগে ভাগ করছি:

তাসাউফের প্রকারসমূহ:

প্রথমত: কট্টরপন্থী তাসাউফ

কট্টরপন্থী তাসাউফের অনুসারী সূফীরা বাড়াবাড়ির কারণে ইসলাম থেকে বের হয়ে গিয়েছে, (অথবা ইসলামেই প্রবেশ করেনি, তবে ইসলামি পোশাক পরেছে ইসলামকে ধ্বংস করার নিমিত্তে অথবা মুসলিমদের শাস্তি থেকে মুক্তি পাওয়ার উদ্দেশ্যে), এ প্রকার তাসাউফের দু'টি ধারা রয়েছে:

১. দার্শনিক তাসাউফ:

দার্শনিক তাসাউফ গ্রীক ও হিন্দু দর্শন শাস্ত্রের উপর নির্ভরশীল, তার ধারকেরা বাতেনিদের নিকটবর্তী, তারা দর্শন শাস্ত্রের ভিত্তিতে ইলাহ ও পৃথিবী সংক্রান্ত বিষয়ে সাধনা করে, এ জন্য দেখি তাদের লেখনী দর্শন শাস্ত্রের পরিভাষায় পরিপূর্ণ, যেমন: (আকল কুললি, নাফসুল কুল্লিয়াহ, 'আরদ, জাওহার, সূরাহ ও হায়উলি)।[1]

তারা ইত্তেহাদ (সৃষ্টির সাথে স্রষ্টার একাকার হওয়া) ও ওয়াহদাতুল ওজুদে (সর্বেশ্বরবাদে) বিশ্বাসী। ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত তাদের প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব হচ্ছে: ইবনে আরাবি ও ইবনুল ফারিদ।

২. বৈরাগী তাসাউফ:

বৈরাগ্যতার সাথে সম্পৃক্ত করে বৈরাগী তাসাউফ বলা হয়, এ তাসাউফকে বৌদ্ধিশ তাসাউফও বলা হয়। এ প্রকার তাসাউফ শারীরিক ব্যায়াম, নির্জনতা, পরিশ্রম ও ধ্যানের উপর নির্ভরশীল। বৈরাগী সূফীরা বৌদ্ধদের সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ। কুমন্ত্রণা, হৃদয়ে জাগ্রত ভাবনা ও প্রবৃত্তকে দমন করার জন্য তারা জমিনে বিচরণ করে ও নির্জনে একান্ত হয়ে সাধনা করে। তারা নেচে-গেয়ে কবিতা আবৃত্তি, গল্প-কাহিনী ও জিকির চর্চা করে। অনুরূপ তারা গুরুত্বারোপ করে অস্বাভাবিক ঘটনা ও কারামতের প্রতি, এসবের জন্য তারা জাদু ও জিনদের ব্যবহার করে।

---

[1] সূরাহ হচ্ছে বাহ্যিক দৃশ্য, হায়উলি হচ্ছে উপাদান ধাতু, যেমন চেয়ার হচ্ছে সূরাহ আর তার কাঠ হচ্ছে হায়উলি।

এ গোষ্ঠীর আকিদা অনেক, যেমন: হুলুল (আল্লাহ কারও শরীরে প্রবেশ করা), ইত্তেহাদ (আল্লাহ তার সৃষ্টির সাথে একীভূত হওয়া বা সৃষ্টি তার স্রষ্টার সাথে একীভূত হওয়া), ওহদাতুল ওজুদ (সর্বেশ্বরবাদ বা সবকিছুতে আল্লাহ আছেন বিশ্বাস করা) ও তাফউয়িদ। তাফউয়িদ অর্থ, আল্লাহ তা'আলা পৃথিবী পরিচালনার দায়িত্ব তথাকথিত কুতুব ও আউলিয়াদের সোপর্দ করেন।

ইসলামি বিশ্বের অধিকাংশ সূফীবাদী মতাদর্শে বিশ্বাসী বিভিন্ন তরীকার সূফীরা এ মতাদর্শে বিশ্বাসী, তবে তাদের মাঝে কিছু ভিন্নতা রয়েছে, তাদের কারো সাথে প্রথম প্রকার তাসাউফের অনেক মিল দেখা যায়। অতএব তাসাউফ এক চিন্তা ও মতাদর্শে সীমাবদ্ধ নয়, বরং এক ব্যাপক আদর্শ ও বিপরীতমুখী বিভিন্ন তরিকার সমন্বয়। সূফীরা একই সময়ে বিপরীতমুখী বিভিন্ন আকিদায় বিশ্বাস করে।

দ্বিতীয়ত: বিদ'আতি তাসাউফ:

বর্তমান ও পূর্বের যুগে অনেক মুসলিম ভালো নিয়তে তাসাউফের সাথে সম্পৃক্ত হয়, তাদের ধারণা এটা এক পরিভাষা, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার সাহাবিদের আদর্শের উপর তার ব্যবহার হয়, যেমন মুরাকাবাহ (আত্মপর্যবেক্ষণ), মুহাসাবাহ (আত্মসমালোচনা), আখিরাতের প্রতি উৎসাহ ও দুনিয়ার প্রতি নির্মোহ। তবে তাসাউফের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তির পক্ষে ছোট কিংবা

বড় বিদ‘আত থেকে মুক্ত থেকে তা চর্চা করা প্রায় অসম্ভব। তাদের অধিকাংশের আকিদা আল্লাহর সিফাৎ ও তাকদীর সম্পর্কে সঠিক নয়, দুনিয়া ও অন্যান্য বিষয়ে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি যথাযথ নয়। তাই উম্মতের আকিদা, ইলম ও সভ্যতা বিনষ্ট হওয়ার পেছনে এর প্রভাব সুস্পষ্ট।

যে মুসলিম বিশুদ্ধ আকিদা ও ইবাদতের অধিকারী, তার পক্ষে বৈধ নয় তাসাউফ কিংবা অন্য কোনো দলের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া, তার সম্পর্ক হবে ইসলাম ও সুন্নতের সাথে, যেমন আমরা পূর্বে বলেছি।

বিভিন্ন ফিরকার সাথে তাসাউফের সম্পর্ক:

তাসাউফের সাথে শিয়াদের সম্পর্ক অধিক। শিয়া ও তাসাউফ ওতপ্রোতভাবে জড়িত, তাসাউফের খুব কম শায়খই রয়েছে যার সম্পর্ক আহলে বাইতের সাথে নেই। সূফীরা তাই দাবি করে শিয়ারা যা দাবি করে, যেমন ইলমে বাতিন, দুনিয়ায় কর্তৃত্ব করা ইত্যাদি। শিয়ারা যেমন তাদের ইমামদের ইবাদত করে অনুরূপ সূফীরাও তাদের পীরদের ইবাদত করে।

বাস্তব কথা হচ্ছে, বর্তমান ও অতীতকালের পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের গবেষকগণ ঘোষণা করেছেন, কট্টরপন্থী তাসাউফ, কট্টরপন্থী শিয়া ও বাতেনি সম্প্রদায় মূলত এক বস্তুর তিনটি শাখা, অথবা একই বস্তুর তিনটি বাহ্যিক রূপ, যার উদ্দেশ্যও এক, অর্থাৎ ভেতর থেকে ইসলামকে ধ্বংস করা।

সূফীদের তরিকা ও তার রুকন:

সূফীদের নিকট ‘তরিকা’ হচ্ছে একটি পদ্ধতির প্রতীক, যার উপর বিচরণ করে ইবাদতকারী স্বীয় মা‘বুদ পর্যন্ত পৌঁছায়।

তরিকায় চলাচলের হিসেবে সূফীর তিনটি স্তর রয়েছে:

১. মুরিদ: সূচনাকারী, যে শায়খ থেকে গ্রহণ করে।

২. সালেক: যে ব্যক্তি অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছার জন্যে বিভিন্ন ব্যায়াম ও মুজাহাদায় রত হয়।

৩. ওয়াসিল: অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনকারী, অভীষ্ট লক্ষ্য হচ্ছে আল্লাহতে বিলীন হওয়া অথবা তার সাথে একাকার হওয়া। কট্টরসূফীরা বিশ্বাস করে ওয়াসিলদের থেকে আল্লাহর আদেশ-নিষেধ ও বিধান রহিত হয়ে যায়, কারণ সালাত, যাকাত ও সওমের উদ্দেশ্য হচ্ছে... তাদের ধারণায়: আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছা, যে পৌঁছে গেছে তার এসবের প্রয়োজন নেই।

তরিকার রুকনসমূহ:

এক: শায়খ

(সূফীদের মতে) কেউ একাকী কখনো আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছাতে সক্ষম নয়, সূফীদের নিকট শায়খ শুধু শিক্ষার মাধ্যম কিংবা এক উসিলা নয় পিতা কিংবা শিক্ষকের মত, বরং সে ঈমান ও গ্রহণীয় হওয়ার মাধ্যম।

এ জন্য শায়খের নিঃশর্ত আনুগত্য করা জরুরি, শায়খের সামনে মুরিদ এমন হবে যেমন গোসল দাতার সামনে মৃত লাশ। মুরিদের পক্ষে শায়খের উপর আপত্তি করা কিংবা প্রশ্ন করা বৈধ নয়, শায়খ যত খারাপ অথবা হারাম কর্ম করুক, যদিও সে প্রশ্ন উদিত হয় মুরিদের নিজের অন্তরের অন্তস্থলে, বরং তার সামনে প্রকাশ্যে ও গোপনে আত্মসমর্পণ করাই জরুরি।

মুরিদের কর্তব্য শায়খের আদেশ, জিকির ও নির্দেশিত সালাত পরিপালন ও অনুসরণ করা, তার করামত প্রচার করা এবং তার পক্ষে প্রতিরোধ করা।

দুই: নির্জনতা

প্রকৃত সূফীর জন্য নির্জনতা খুব জরুরি, হোক সেটা ঘরের কোণে, কিংবা ময়দানে কিংবা জঙ্গলে। অন্ততপক্ষে নির্জনতা অর্জনের জন্য চেহারা ও মাথার উপর মোটা কাপড় মুড়িয়ে মানুষ থেকে আড়াল হবে, দীর্ঘ সময় জিকিরে মশগুল থাকবে ও প্রত্যেক বস্তু থেকে স্বীয় অন্তরকে খালি করবে।

সূফী নির্জনতায় মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়, এমন কি জুমা ও জামা'আত থেকেও বিচ্ছিন্ন হয়, নির্দিষ্ট সিয়াম ও নির্দিষ্ট জিকিরে লিপ্ত হয়, যতক্ষণ না কাশফের দ্বার উন্মুক্ত ও জ্ঞানের বারি বর্ষণ হয়।

তিন: ফাতহ ও মুকাশাফাহ

লাগাতার নির্জনতা ও যিকিরের ফলে ফাতহ ও মুকাশাফাহ হাসিল হয়। ফাতহ ও মুকাশাফার প্রকাশ ঘটে বিভিন্নভাবে, কখনো সরাসরি ডাক ও সম্বোধনের মাধ্যমে, যা সূফী শুনতে পায়, অথবা আকৃতি ধারণ করে, যা সূফী নিজের সমানে দেখতে পায়, অথবা সূফীর হাতে অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটে ইত্যাদি, যার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই যে, এগুলো শয়তানি ইশারা, অথবা শয়তানি আওয়াজ ও শয়তানি কর্ম।

চার: করামত

সূফীর ওলি হওয়ার জন্য কারামত জরুরি, যেমন প্রত্যেক নবীর জন্য মু'জিযা জরুরি। সূফীরা ওলি হওয়ার প্রমাণস্বরূপ অনেক করামত দাবি করে, কতক মিথ্যা ও কতক বানোয়াট, কতক দীর্ঘ সাধনার ফল, অথবা জাদু ও শয়তান থেকে সাহায্য গ্রহণ করার ফল অথবা গোপন কোনো প্রতারণা।

কতক সূফী বাতাসে উড়ে, অথবা পানিতে হাঁটে, অথবা নিজেকে জখম করে অথচ তার কোনো ক্ষতি হয় না, অথবা দীর্ঘ দিন যাবত পানাহার ত্যাগ করে... আর দাবি করে এটা তার ওলি হওয়ার কারামাত।

তাসাউফ যে পথভ্রষ্ট ও ইসলাম থেকে বিচ্যুত এগুলো তার স্পষ্ট প্রমাণ, কারণ সবচেয়ে বড় ওলি ছিলেন নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি

ওয়াসাল্লামের সাথীগণ (সাহাবীগণ), অথচ তাদের থেকে এ জাতীয় কোনো কারামত প্রকাশ পায় নি।

আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত সত্য কারামত বিশ্বাস করে, সবচেয়ে বড় করামত হচ্ছে, মানুষের কুরআন ও হাদিসকে আঁকড়ে ধরা, বিদ'আত ও অশ্লীলতা থেকে তার দূরে থাকা, জিহাদ ও আল্লাহর দিকে আহ্বান করা এবং কষ্টের উপর ধৈর্য ধারণ করা।

এসব অস্বাভাবিক ঘটনা সম্পর্কে জানা জরুরি যে, ফিরআউন, হিন্দু ও ইয়াহূদীরা এ জাতীয়, বরং এর চেয়ে বড় জাদু কর্ম আঞ্জাম দেয়। অতএব সুন্নতকে আঁকড়ে ধরা ও তাকওয়ার সাধনা ব্যতীত যা কিছু প্রকাশ পায় সেটা যদি বিলায়েত তথা ওলি হওয়ার মাপকাঠি হয়, তাহলে ওলি, জাদুকর ও ভেলকিবাজির মাঝে কোনো পার্থক্যই নেই।

সূফীদের গুরুত্বপূর্ণ আকিদা:

১. হুলুল (কোনো নির্দিষ্ট সৃষ্টিতে প্রবিষ্ট হওয়া), ইত্তেহাদ (স্রষ্টা ও সৃষ্টি এক হওয়া) ও ফানা (স্রষ্টায় লীন হওয়া)র আকিদা, হিন্দু ও বৌদ্ধদের ন্যায়।

২. কুরআন ও সুন্নাহ থেকে (তথাকথিত) হাকিকত ও মারেফাত হাসিল হবে না, বরং সেটা অর্জন হবে কাশফ, অথবা ইলমে লাদুন্নি (বাতেনি ইলম), ইলহাম ও রুচির মাধ্যমে। (অর্থাৎ সূফীদের নিকট ওহির অর্থ ব্যাপক, ওহি শুধু নবীদের মাঝে সীমাবদ্ধ নয়, বরং সকল ওলির উপরও ওহি হয়)।

৩. তাদের আকিদা, তরিকার শেষ প্রান্তে যে পৌঁছে ও ইয়াকিন হাসিল করে তার থেকে ইবাদত ও বিধি-নিষেধ রহিত হয়।

৪. আল্লাহর বিলায়েত (ওলিত্ব) দাবি করা, তাদের অনেকের দৃষ্টিতে নবীদের উপর ওলিদের মর্যাদা। তাদের সর্বশেষ ওলি সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর অগ্রাধিকার প্রাপ্ত। আশ্চর্য বিষয় হচ্ছে প্রত্যেক যুগে তাদের অনেকে দাবি করেছে সেই সর্বশেষ ওলি। এতদসত্ত্বেও সূফীরা সবার সাথে সম্পর্ক কায়েম করে ও সবাইকে পবিত্র জানে।

৫. কারামতের দাবি করা ও তার দ্বারা চ্যালেঞ্জ ছোড়া।

৬. অদৃশ্য ব্যক্তিদের উপর ঈমান আনা, যেমন আকতাব, আওতাদ, নুকাবা ও নুজাবা... ইত্যাদি।

তারা বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ তা'আলা জগতের কর্তৃত্ব ও পরিকল্পনার দায়িত্ব তাদের নিকট প্রদান করেছেন, অথচ আল্লাহ এসব কুসংস্কার থেকে পবিত্র।

সূফীরা এ জন্য তাদেরকে আহ্বান করে, তাদের নিকট প্রার্থনা করে, তাদের জন্য বিভিন্ন মাযার ও পবিত্র স্থান তৈরি করে, যেন মানুষ বরকত ও দো'আর জন্য সেখানে যায়।

৭. বিদ'আত ও কুসংস্কার দ্বারা ইবাদত করা: সূফীরা নির্জনতা গ্রহণ করে ও নিজেদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন ওযিফা ও জিকির নির্ধারণ করে নেয়, যা তারা বিশেষ মুহূর্তে হাজারো বার পাঠ করে, আর

তারা মনোযোগ বৃদ্ধি, তাযকিয়াহ ও নৈকট্য লাভের জন্য নাচ-গান করে।

৮. সূফীরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে বাড়াবাড়ি করে, যেমন শিয়ারা আলী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু সম্পর্কে, বৌদ্ধরা বৌদ্ধ সম্পর্কে আর খৃস্টানরা ঈসা আলাইহি সালাম সম্পর্কে বাড়াবাড়ি করে।

একটি উদাহরণ: সূফীদের ধারণা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বপ্রথম সৃষ্টি, আল্লাহ তা‘আলা তাকে স্বীয় নূর থেকে সৃষ্টি করেছেন,—আল্লাহ তাদের এসব বাজে বিশেষণ থেকে অনেক উর্ধ্বে—তারা আরও বলে থাকে যে, তিনি সকল গায়েব জানেন, তার হাতে রয়েছে আসমান ও জমিনের চাবি। তারা নির্দিষ্ট কতক দরূদ তৈরি করে তার দ্বারা তার উপর দরূদ পাঠ করে, যার অর্থ বাড়াবাড়ি ও অতিরঞ্জনে পূর্ণ।

আরেকটি উদাহরণ: সূফীরা আল্লাহ ব্যতীত নবীকে আহ্বান করে ও তার নিকট আশ্রয় চায়। তারা আকতাব ও সকল অদৃশ্য পুরুষকেও আহ্বান করে।

উম্মতে মুসলিমার উপর তাসাউফের প্রভাব:

উম্মতে মুসলিমার আকিদা ও জীবনে তাসাউফের ব্যাপক প্রভাব পড়েছে, তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে:

১. সূফীরা যে শির্ক ও মৃত ব্যক্তির ইবাদত ইসলামে দাখিল করিয়েছে তার দ্বারা তাওহিদুল ইবাদাহ ব্যাপকভাবে ধ্বংস ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এগুলো শিয়া ও সূফীরা ইসলামে প্রবেশ করিয়েছে মূলত বৌদ্ধদের থেকে, যা উবাইদি (তথাকথিত ফাতেমী) শাসনামলে মিসর, মরক্কো ও প্রাচ্যে রাফেদি রাজ্যসমূহে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল।

২. তারা হুলূল, ইত্তেহাদ ও আল্লাহকে মখলুকের সাথে তুলনা করে তাওহিদুর রুবুবিয়্যাহ এবং তাওহিদুল আসমান ও সিফাতকে ব্যাপকভাবে ধ্বংস করে, যেমন: তাদের বড়দের কতক বাণী: (আমি আল্লাহ), (আমার পবিত্রতা, আমার পবিত্রতা, আমার শান কি মহান), (জুব্বার ভিতরে আল্লাহ ব্যতীত কেউ নেই)।

তাছাড়া সুন্দর চেহারা ও সুন্দর আকৃতির প্রতি তাদের প্রেম সর্বজন বিদিত, তাদের ধারণা আল্লাহ তাতে প্রবেশ করে, অথবা এটা আল্লাহর সৌন্দর্যের প্রকাশ, অথচ আল্লাহ তাদের এসব বিশেষণ থেকে কতই না পবিত্র!

৩. উম্মতে ইসলামিয়াকে বিভক্ত ও বিভিন্ন ফেরকার সাথে সম্পৃক্ত করা। বস্তুত সূফীদের পরস্পর বিরোধী অনেক তরিকা রয়েছে, তার সাথে অনেক মুসলিম সম্পৃক্ত হয়ে নিজেরা শতধা বিভক্ত হয়ে পড়ে, যেমন কাদেরিয়া, রিফা'ঈয়াহ, তিজানিয়্যাহ, সাযেলিয়াহ, নকশেবন্দিয়াহ, মিরগানিয়াহ, আহমাদিয়া—আহমদ বাদাওয়ীর সাথে সম্পৃক্ত—, প্রত্যেক তরিকার রয়েছে পৃথক ওযিফা, জিকির, ইবাদত

ও বিশেষ দরূদ। প্রত্যেক তরিকা দাবি করে তারা একাই সত্য ও সঠিক পথের উপর, বরং প্রত্যেক তরিকা আবার বিভিন্ন ফেরকা ও অনেক তরিকায় বিভক্ত।

৪. জিহাদ ত্যাগ করা: বরং সাধারণভাবে আমল পরিত্যাগ করা: সূফীরা জিহাদ ও আমল ত্যাগ করার ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা রাখে, ইতিহাস সাক্ষী, কতক সূফী তাতারিদের বাগদাদে প্রবেশ করার সময় সাহায্য করেছিল, বর্তমান ইউরোপীয় উপনিবেশদের সাহায্য করছে তারাই।

৫. ইলমি জীবনকে ধ্বংস করা: শারীরিক সাধনা, নির্জনতা, ওযিফা ও নানা ওরসে সূফীদের মনোযোগ সীমাবদ্ধ। এসব কারণে তারা ইলম থেকে দূরে থাকে, অধিকন্তু ইলমের প্রতি তাদের তাচ্ছিল্য তো আছেই, যেমন তারা ইলমকে বলে: ইলমে জাহির, ইলমুল ওরাক, অথবা ইলমুর রুসুম ইত্যাদি।

তাছাড়া সূফীরা কাশফ ও ইলহামের প্রতি গুরুত্বারোপ করে চিন্তা শক্তি, ইজতিহাদ ও বিবেকের ক্রিয়াশীলতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে ব্যাপকভাবে।

৬. ইসলামি সভ্যতার পতন ঘটানো: পূর্বে উল্লেখিত কর্মকাণ্ডের সাথে সূফীরা তাদের নিঃস্বতা, ভিক্ষাবৃত্তি ও কল্পনাপ্রসূত কতক উসিলা যোগ করে ইসলামি সভ্যতাকে নিম্নমুখী ও পতনের দিকে ঠেলে দেয়,

যার নামকরণ করে তারা: হুজুব, তাবিজ ও হুসুন ইত্যাদি। যাতে তারা কল্যাণ আহরণ ও অকল্যাণ প্রতিহত করার বিশ্বাস করে থাকে।

৭. সূফীরা কতক আকিদা ও শারয়ী পরিভাষার অর্থ পরিবর্তন করে, যেমন: তাওয়াককুল, যুহুদ, কাদর। তাদের নিকট এগুলো পরিবর্তিত হয়ে রূপান্তরিত হয় পরনির্ভরতা, ভিক্ষাবৃত্তি ও অক্ষমতায়।

অধ্যয়নের জন্য মূলপাঠ

সূফীদের নিকট ওহদাতুল ওজুদ:

ইবনে আরাবি[1] বলে: "আল্লাহর সুন্দর নামের একটি হচ্ছে: 'আল-আলীয়্যু' (অর্থ সুউচ্চ), কার উপর উচ্চ? অথচ সেখানে তিনি ব্যতীত কেউ নেই, তিনি সুউচ্চ নিজে নিজেই,, অথবা কিসের তুলনায় সুউচ্চ? সেখানে তো তিনিই তিনি। অতএব তার নিজের জন্যই নিজের উচ্চতা, আর তিনি ওজুদ বা অস্তিত্ব হিসেবে হুবহু অস্তিত্বশীল বা মওজুদ। অতএব মূসাম্মা বা নামযুক্ত বস্তু মুহদাসাত[2] বা সৃষ্টজীব, নিজে নিজে সুউচ্চ, আর সুউচ্চ আল্লাহ ব্যতীত কেউ নয়। তিনি সুউচ্চ, তবে তার উচ্চতা তুলনামূলক নয়, কারণ অনস্তিত্ব অস্তিত্বের গন্ধ পায়নি, সে অস্তিত্বশীল বস্তুতে একাধিক আকৃতিতে ঠিকই, কিন্তু মূল বস্তু এক, যেমন সমষ্টিগত বস্তুর ভেতর থেকে একটি বস্তু সমষ্টির বিচারে এক। অতএব নামের মধ্যে আধিক্য থাকা, বস্তুত নাম সম্পর্ক, নাম অনস্তিত্বশীল, অথচ তাও আইন (মূল বস্তু), যা প্রকৃত সত্তা। অতএব তিনি নিজের অপেক্ষায় সুউচ্চ, কারো তুলনায় নয়।

---

[1] তার পুরো নাম: মুহাম্মদ ইবনে আলি আল-হাতেমি আত-তাঈ, উপাদি 'মুহিউদ্দিন ইবনে আরাবি', মৃত (৬৩৮হি.), সূফীরা তাকে পবিত্র জানে ও খুব সম্মান করে, তাকে শায়খে আকবার বলা হয়।

[2] মুহদাসাত অর্থ মাখলুকাত।

যেমন তুমি বল: তিনি, তিনি নয়, তুমি, তুমি নয়।

খাররায[1] বলেন: তিনি হকের চেহারার এক চেহারা, হকের জবানের এক জবান, যা নিজের সম্পর্কে বলে: আল্লাহর পরিচয় বর্ণনা করা যায় না তবে তার উপর দু'টি বিপরীত বস্তুর হুকুম প্রয়োগ করা ব্যতীত। তিনি প্রথম তিনি শেষ, তিনি প্রকাশ্য তিনি অপ্রকাশ্য। যা প্রকাশ হয় তার মূল সত্তা তিনি, তার প্রকাশ অবস্থায় যা অদৃশ্য তার মূল সত্তাও তিনি। সেখানে কেউ নেই যে তাকে দেখে তিনি ব্যতীত, সেখানে কেউ নই যে তার থেকে অদৃশ্য হয়, তিনি নিজের জন্য প্রকাশ্য, নিজের থেকেই অদৃশ্য। তিনি আবু সাইদ আল-খাররায ও অন্যান্য মখলুকেরই নাম"।[2]

---

[1] আবু সাঈদ খাররায সূফীদের আগের যুগের ইমাম।

[2] ফুসুসুল হিকাম: (পৃ.৭৬-৭৭), মিসর থেকে ছাপা।

বাতেনিয়াহ

বাতেনিয়াহ: ইসলামি ইতিহাসে সবচেয়ে ক্ষতিকর ও খারাপ দল হচ্ছে বাতেনি ফিরকা। বাতেনিরা ইসলামি দল নয়, বরং মুসলিমদের ঐকমত্যে তারা ইসলাম থেকে বহিষ্কৃত। বাতেনিরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত, গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি দল আমরা উল্লেখ করবো:

কেন বাতিনিয়াহ বলা হয়?

বাতিনিয়াহ বলার কারণ, তারা বিশ্বাস করে কুরআন ও সুন্নার দু'টি অবস্থা: জাহির ও বাতিন। জাহির হচ্ছে যা মানুষ জানে ও আলেমরা যা শিখায়, বাতিন হচ্ছে প্রকৃত ইলম, যা আহলে বাইতের অদৃশ্য ইমামগণ ব্যতীত কেউ জানে না, তারা মানুষকে সে ইলম সরাসরি বা নায়েব ও পর্দার আড়াল থেকে শিক্ষা দেন।

বাতেনিদের উৎস ও উদ্দেশ্য:

আল্লাহ তা'আলা সত্য দীন ও হিদায়েত দিয়ে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণ করেছেন সকল দীনের উপর তাকে বিজয়ী করার উদ্দেশ্যে, যদিও মুশরিকরা অপছন্দ করে। কাফেরদের দেশে ইসলাম ছড়িয়ে পড়ে তাদের আকিদা, রাজত্ব ও কর্তৃত্ব খর্ব করে, তাই বিলুপ্ত ধর্ম ও পতিত রাজত্বের উত্তরসূরিরা ভেবে দেখল—বিশেষ করে অগ্নিপূজক ও ইয়াহূদীরা—ইসলামকে ধ্বংস ও তার

থেকে প্রতিশোধ নিতে হলে পরস্পর সহযোগিতা ও সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা ব্যতীত গত্যন্তর নেই।

উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহুকে গুপ্ত হত্যার ষড়যন্ত্র দিয়ে তারা শুরু করে। অতঃপর ফেতনার সূচনা করে, যার নেতৃত্ব দেয় আব্দুল্লাহ ইবনে সাবা নামক ব্যক্তি খলীফা উসমান ও আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমার যুগে, যেমন পূর্বে গত হয়েছে।

কিন্তু তারা দেখল ইসলাম তাদের সকল ষড়যন্ত্রের মোকাবিলায় অনেক শক্তিশালী, ফলে তারা এক মাযহাব সৃষ্টির সূচনা করে, যা শিয়াদের চেয়েও অধিক প্রভাবশালী ও ক্ষতিকর—যদিও তার শুরু শিয়াদের নীতি ও তাদের ছদ্মাবরণে—এভাবে তারা বাতেনি মাযহাবের গোড়া পত্তন করে, তাদেরকে সাধারণত ইসমাইলিয়া বলা হয়, ইসমাইল ইবনে জাফর সাদিকের সাথে সম্পৃক্ত করে। তাদের ইমামদের ধারণা এই যে, আকিদা ও বংশের দিক থেকে তারা ইসমাইল ইবনে জাফর সাদিকের সাথে সম্পৃক্ত।

তাদের মাযহাবের মূলনীতি তৈরিতে অগ্নিপূজক, ইয়াহূদী ও যিন্দিকদের একটি জামা'আত অংশ নেয়, তারা মৌলিকভাবে গ্রীক দর্শনকে সামনে রেখে অগ্নিপূজক ও সাবায়িদের চিন্তার সাথে মিল করে বাতেনি মাযহাব তৈরি করে।

চতুর্থ শতাব্দীর শুরুতে বাতেনি মাযহাবের মূলনীতির উপর তারা প্রথম কিতাব রচনা করে (رسائل إخوان الصفا وخلّان الوفا) নামে।

বাতেনিরা বাতেনিয়াহ রাজ্য প্রতিষ্ঠায় সফল হয়। তারা মুসলিম উম্মাহকে টুকরো টুকরো করাসহ ইয়াহূদী ও মোগলি আগ্রাসনের জন্য মুসলিম খিলাফতকে প্রস্তুত করে, লাখো সাধারণ মুসলিমের আকিদা বিনষ্ট করার কৃতিত্ব তো আছেই তাদের।

বাতেনিদের গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রসমূহ:

১. উবাইদি রাজত্ব (ফাতেমিয়া):

উবাইদি রাজত্ব মূলত নাস্তিক্যবাদ বাতেনি রাজত্ব ছিল, যা প্রতিষ্ঠা করেছে একজন ইয়াহূদী, নাম আব্দুল্লাহ ইবনে মায়মুন আল-কাদ্দাহ, তার ধারণা সে ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু 'আনহার বংশধর। তারা প্রায় দুই শতাব্দী মিসর ও অন্যান্য দেশে রাজত্ব করে, তাদের নিদর্শন: উম্মতে মুসলিমার মাঝে শির্ক ও মৃত ব্যক্তির ইবাদত দাখিল করা, অনুরূপভাবে তাদের সাহায্য-সহযোগিতাতেই খৃস্টানরা মুসলিমদের অপমান ও লাঞ্ছিত করে তাদের দেশে প্রবেশ করে কুদস দখল করে নেয়। পরবর্তীতে সালাউদ্দিন আইউবি রাহিমাহুল্লাহ প্রথম উবাইদি রাজত্ব ধ্বংস করেন, অতঃপর খৃস্টানদের উচ্ছেদ করেন।

২. কারামিতাহ রাজত্ব:

উবাইদিদের প্রাচ্যে কারামিতাদের রাজত্ব ছিল, অর্থাৎ শাম, দক্ষিণ ইরাক ও জাযিরাতুল আরবের পূর্বাঞ্চলে। তারা ৩১৭হি. (৮-যিলহজ্ব) তারবিয়ার দিন, মক্কায় প্রবেশ করে হাজি ও মুসল্লিদের হত্যা করে, হাজরে আসওয়াদকে খুলে তাদের সাথে আহসা নিয়ে যায়, সেখানে

তাদের নিকট হাজরে আসওয়াদ ২২বছর থাকে, অতঃপর তারা কাবা ও পুরো মক্কা লুণ্ঠন করে।

৩. হাশশাশিউন:

হাশশাশিয়াহ মূলত উবাইদি রাজত্বের উত্তরসূরি ইসমাইলি সম্প্রদায়ের একটি দল। তারা ইরানে রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করে এবং যুদ্ধ, লুণ্ঠন ও অপহরণ করে উম্মতে মুসলিমার মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দেয়। তারা বহু রাজনৈতিক ও ইসলামিক ব্যক্তিকে গুপ্ত হত্যা করে, যাদেরকে গুপ্ত হামলার মাধ্যমে হত্যা করার চেষ্টা করেছে তন্মধ্যে সালাহুদ্দিন আইউবি অন্যতম।

ষষ্ঠ শতাব্দীর শুরুতে তাদের রাজত্ব আরম্ভ হয়, তাতারিদের দ্বারা ধ্বংস হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাদের দৌরাত্ম্য চলমান থাকে।

তবে তাদের দাওয়াত এখনো বিদ্যমান, এখন তারা আগাখানিয়াহ নামে পরিচিত, তাদের নেতা আগাখানের সাথে সম্পৃক্ত করে আগাখানিয়াহ বলা হয়।

বাতেনিদের আকিদা ও বিভিন্ন দল:

বাতেনিদের কতক নীতি আছে যৌথ, যেখানে গিয়ে তারা সবাই মিলে যায়। আবার তাদের ফেরকার যৌথ নীতিও রয়েছে, তবে তার ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে তারা একমত নয়।

কতক বাতেনি ফেরকা আছে আলাদা বৈশিষ্ট্যের অধিকারী, তাই আমরা ইসমাইলি ফেরকার আকিদা উল্লেখ করব, যার অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে

ক্কারামিতা, উবাইদিয়া, ইসমাইলিয়াহ আগাখানিয়াহ ও ইসমাইলিয়াহ বুহরাহ ফেরকা। তাদের থেকে দ্রূয ও নুসাইরিয়া ফেরকার আলোচনা পৃথকভাবে করবো।

ইসমাইলিয়াহ

বাতেনি উবাইদি রাজত্বের উত্তরসূরি হচ্ছে ইসমাইলিয়াহ, তারা ইসমাইল ইবনে জাফর সাদিকের সাথে নিজেদেরে সম্পৃক্ত করে থাকে, যিনি শৈশবে নিঃসন্তান মারা যান। কিন্তু এক ইয়াহূদী যিন্দিক, যার নাম মায়মুন আল-কাদ্দাহ, সে দাবি করে ইসমাইল মারা যায়নি, আত্মগোপন করেছে, তিনি বর্তমান ইমাম বা ইমামুজ্জামান।

অতঃপর সে দাবি করে ইসমাইলের একজন সন্তান হয়েছিল তার নাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল। শিয়াদের সামনে (মায়মুন আল-কাদ্দাহ) মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল ইবনে জাফর হিসেবে প্রকাশ পায়।

তার ছেলে (আব্দুল্লাহ ইবনে মায়মুন আল-কাদ্দাহ)-কে মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইলের সন্তান প্রচার করে, মূলত এ আব্দুল্লাহ উবাইদি শাসকদের প্রকৃত পিতা, তারা ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহার সন্তান নয়, বরং ইয়াহূদী বংশোদ্ভূত।

ইসমাইলিরা উবাইদিদের ইমামতে ঐকমত্য ছিল, যখন তাদের খলিফা (মুস্তানসির বিল্লাহ) (৪৮৭হি.) মারা গেল, তখন তারা দু'দলে ভাগ হয়:

১. এক দল বলে: মুস্তানসির থেকে ইমামত বা দীনী নেতৃত্ব তার ছেলে (মুসতা'লি)-র নিকট প্রত্যাবর্তিত হয়েছে, তাদেরকে বুহরাহ বলা হয়। তারা দক্ষিণ ভারত, কেনিয়া ও ইয়ামানে বাস করে।

তাদের নেতাকে বলা হয় সুলতানুল বুহরাহ। তাদেরকে সাইফিয়ূনও বলা হয়।

২. দ্বিতীয় দল বলে: মুস্তানসির থেকে ইমামত বা দীনী নেতৃত্ব তার ছেলে (নাযার ইবনুল মুস্তানসির)-এর নিকট প্রত্যাবর্তন করেছে, বর্তমান তারা আগাখানিয়া নামে প্রসিদ্ধ। পাকিস্তান, ভারত ও শাম দেশে তাদের বসবাস, তাদের সংখ্যাই বেশি।

লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, ইসমাইলিদের সাথে ইংরেজদের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ, ইংরেজদের বন্ধু হিসেবে তারা প্রসিদ্ধ।

বর্তমান আগাখানির মা ইংরেজ, তার স্ত্রীও ইংরেজ, আর সে প্যারিসে বাস করে।

ইসমাইলিদের গুরুত্বপূর্ণ আকিদা:

১. কুরআন ও সুন্নাহর প্রত্যেক জাহিরের (প্রকাশ্য অর্থের) বাতিন (গোপন অর্থ) আছে, ইমামগণ ব্যতীত কেউ বাতিন জানে না।

২. আল্লাহর সিফাৎ অস্বীকার করা, এমন কি তাদের আকিদা মতে এতটুকুও বলা যাবে না: আল্লাহ আছে বা নেই, তাকে কোনো বিশেষণ দ্বারা বিশেষায়িত করা যাবে না।

৩. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল ইবনে জাফর ইসলাম রহিত করেছে।

৪. কুরআন ও ওহির অধিকাংশ বরকত আকলে কুল্লি[1] থেকে এমন প্রত্যেক ব্যক্তির উপর নাযিল হয়, যার মধ্যে ওহি গ্রহণ করার যোগ্যতা আছে।

৫. তারা আকিদা ও শরীয়তের অদ্ভুত ব্যাখ্যা করে, যার মূল হচ্ছে হরফগুলো নির্দিষ্ট সংখ্যার প্রতীক, অতঃপর তারা ইচ্ছামত সংখ্যার ব্যাখ্যা প্রদান করে।

৬. কিয়ামত ও পুনরুত্থান অস্বীকার করা ও পুনর্জন্মে ঈমান আনা।

৭. বিশ্বাস করা যে, পৃথিবীর পরিকল্পনা ও বিভিন্ন ঘটনা সৃষ্টির ক্ষেত্রে সাত তারার প্রভাব রয়েছে।

৮. স্বেচ্ছাচারিতা, কমিউনিজম সমাজ ব্যবস্থা (অবাধ যৌনাচার) ও (যথেচ্ছা) অর্থ ব্যবস্থায় বিশ্বাসী। তাদের ইমাম এসব বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিবেন।

এগুলো স্মরণ রাখুন, আরেকটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা জরুরি যে, ইসমাইলিদের অনেক স্তর ও ক্রম এবং অনেক উৎসব ও অনুষ্ঠান রয়েছে, যা ইয়াহূদীদের আচার-অনুষ্ঠানের সাথে অদ্ভুতভাবে মিল রাখে।

---

[1] 'আকলে কুল্লি'-র শাব্দিক অর্থ পূর্ণ বিবেক। এখানে উদ্দেশ্য সম্ভত আল্লাহ। অনুবাদক। বরং তারা আল্লাহকে 'আস-সাবেক' বলে, তার কাছ থেকে আল-আকলুল কুল্লীর উপর ফায়েয হয়, তার কাছ থেকে 'পূর্ণ মানুষ' তথা ইমামদের কাছে নির্দেশনা আসে। [সম্পাদক]

অধ্যয়নের জন্য মূলপাঠ

ইয়ামানের ক্বারামতিদের নেতা আলী ইবনে ফাদল (মৃ.৩০৩হি.) সম্পর্কে জনৈক ক্বারামতি কবির কবিতা।

১. হে অমুক, তুমি ঢোল হাতে নাও এবং খেল, তোমার পাপিয়াকে গাইতে দাও, অতঃপর তুমি নাচ।

২. বনু হাশেমের দায়িত্ব নিয়ে ছিলেন একজন নবী, আর এ[1] হচ্ছে বনু ইয়া'রাবের নবী।

৩. বিগত প্রত্যেক নবীর একটি শরীয়ত ছিল, আর এটা হচ্ছে এ নবীর শরীয়ত।

৪. তিনি আমাদের থেকে সালাতের ফরয রহিত করেছেন, রহিত করেছেন সিয়াম, কোনো কষ্ট দেন নি।

৫. মানুষেরা যখন সালাত পড়ে তুমি সেটার জন্য উঠবে না, যদি তারা সিয়াম রাখে তুমি খাও ও পান কর।

৬. সাফার নিকট সাঈ ও ইয়াসরাবে (মদিনায়) কবর যিয়ারত[2] করার ইচ্ছা করো না।

---

[1] আলি ইবনে ফাদল।

[2] জ্ঞাতব্য যে, আমাদের দীনে মসজিদ জিয়ারত করা হয়, কবর যিয়ারত করা হয় না, কিন্তু দীন সম্পর্কে মূর্খ ক্বারমতিরা কবর যিয়ারত সম্পর্কে বলছে। এ কথা সফরের সাথে সংশ্লিষ্ট।

৭. আত্মীয় কিংবা অনাত্মীয়দের উরস থেকে তোমার নফসকে বিরত রেখ না,

৮. কেন সে অনাত্মীয়র জন্য হালাল ও বাবার জন্য হারাম হলো।

৯. ফসলের মালিক কি সে নয়, যে তা লালন করেছে[1] এবং তা শুষ্ক মৌসুমে সিঞ্চন করেছে।

১০. মদ তো আসমানের পানির ন্যায় হালাল, মাযহাবের পক্ষ থেকে তা হালাল করা হয়েছে।[2]

---

[1] অর্থাৎ মেয়েকে লালন পালনকারী পিতাই তার বিয়ের বেশী হকদার, এটাই অগ্নিপূজকদের ধর্ম ছিল, তাদের উপর আল্লাহর লানত।

[2] 'কাশফুল আসরারিল বাতিনাহ' ও 'আল-'আসজাদ আল-মাসবুক' গ্রন্থ থেকে সংকলিত, যা ড. সুহাইল যাক্কার তাহকিক করেছেন। দেখুন: (পৃ.৩০ ও ৪২১)

নুসাইরিয়াহ

সীমালঙ্ঘনকারী শিয়াদের একটি দল হচ্ছে নুসাইরিয়াহ। মূলনীতির ক্ষেত্রে তারা ইসমাইলি বাতেনি ফেরকার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ, তবে এ আকিদায় তাদের সাথে দ্বিমত করে যে, ইলাহ, রাব্বুল আলামীন, আসমান ও জমিনের সৃষ্টিকর্তা হচ্ছে আলী ইবনে আবি তালিব। (আল্লাহর নিকট কুফরি থেকে পানাহ চাই)। এ ফেরকা আরও বেশি সীমালঙ্ঘনকারী এবং তাদের কুফরি সবচেয়ে কঠিন।

শিয়াদের থেকে নুসাইরিদের পৃথক হওয়ার কারণ:

শিয়া দ্বাদশ ইমামিয়ারা বিশ্বাস করে যে, হাসান আসকারি তাদের ইমামদের এগারোতম ইমাম, তারা তার সন্তানের অপেক্ষায় ছিল দ্বাদশ ইমাম বানাবে তাই, পরিবার থেকে চলে আসা বংশানুক্রমিক নীতিস্বরূপ—যেরূপ পূর্বে গত হয়েছে—, কিন্তু হাসান মারা গেছেন কোনো সন্তান রেখে যাননি, ফলে শিয়া নেতৃবৃন্দ মহা সংকটে পড়ে যায় তাদের ইমাম নিয়ে, সর্বশেষ তারা অদৃশ্য ইমাম বানানোর সিদ্ধান্ত নিলো। তারা ধরে নিলো যে, দ্বাদশ ইমাম হলেন মুহাম্মদ ইবনে হাসান আসকারি, তবে সে গুহায় আত্মগোপন করে সামুররা নামক স্থানে, অতিসত্বর শেষ যুগে সে বের হবে। তিনিই হলেন প্রতীক্ষিত ইমাম। শিয়া নেতৃবৃন্দ ধারণা করল যে, তার অনুপস্থিতিতে তারাই তার পর্দা ও প্রতিনিধি। কিন্তু অনৈতিক জীবন-যাপনকারী

এক অগ্নিপূজক, যার নাম মুহাম্মদ ইবনে নুসাইর, এ ক্ষেত্রে সে তাদের বিরোধিতা করল। তার দাবি হচ্ছে সে একাই হাসান আসকারি ও প্রত্যাশিত মাহদির বাব, কিন্তু অন্যরা তার দাবি প্রত্যাখ্যান করল। অতএব সে তাদের থেকে পৃথক হয় এবং একটি পূর্ণাঙ্গ দীন প্রতিষ্ঠা করে, তা-ই হচ্ছে নুসাইরিয়াহ। নুসাইরিয়াহ ফেরকা পূর্বে উল্লেখিত বাতেনি ষড়যন্ত্রের সমসাময়িক ছিল, ফলে নুসাইরিরা তাদের একটি অংশে পরিণত হয়।

উসমানি খিলাফতের সময় নুসাইরিদের 'আলী ইলাহিয়াহ' বলা হত, অর্থাৎ (আলীকে ইলাহ বিশ্বাসকারী), কিন্তু ফ্রান্সিসরা তাদের 'আলাবি নামকরণ করে, কারণ তাদের সাথে ফ্রান্সিসের সখ্যতা খুব গভীর ও প্রসিদ্ধ[1], যেমন দ্রূদ্রযরা ইংরেজদের সখ্যতায় অকপট, তবে উভয় দলের ইয়াহূদী প্রীতি প্রতিযোগিতাপূর্ণ।

নুসাইরিদের গুরুত্বপূর্ণ আকিদা:

---

[1] উল্লেখ্য, ফ্রান্স যখন সিরিয়া ছেড়ে চলে যায়, তখন সংখ্যালঘু 'আলাবিদের হাতে ক্ষমতা ও অস্ত্র দিয়ে যায়, অথচ তখন সিরিয়ার মোট জনসংখ্যার তারা মাত্র ১২% ছিল। সেই থেকে 'আলাবি সরকার বিভিন্নভাবে সিরিয়ার মুসলিমদের উপর নির্যাতন ও নিপীড়ন চালিয়ে আসছে, আল্লাহ মজলুম মুসলিমদের সহায় হোন। অনুবাদক। বর্তমানেও তারাই সিরিয়া দখল করে আছে। হাফেয আল-আসাদ, বাশশার আল-আসাদ এ নুসাইরী ফেরকার লোক। [সম্পাদক]

নুসাইরিদের আকিদা বিভিন্ন আকিদার সংমিশ্রণে গঠিত, তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে: শিয়া, অগ্নিপূজক ও খৃস্টান। এ ছাড়া বাতেনিদের আকিদায়ও তারা রয়েছে। তাদের গুরুত্বপূর্ণ আকিদা:

১. আলী ইবনে আবু তালিবের উলুহিয়াত ও তিন সত্তার ঈমান: আলী, মুহাম্মদ ও সালমান ফারসি।

২. ইসলামি শরীয়তের বিশেষ ব্যাখ্যা প্রদান করা, যেমন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত হচ্ছে: আলী, ফাতিম[1], হাসান, হুসাইন ও মুহসিন। সিয়াম হচ্ছে তাদের ত্রিশ জন ইমামের নাম জপ। ইবলিসের ব্যাখ্যায় তারা উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর নাম বলে।

৩. কিয়ামত ও আখিরাত অস্বীকার করা ও পুনর্জন্মের উপর ঈমান আনা।

৪. হারামগুলোকে হালাল জানা যেমন, মদ, যিনা ও সমকামিতা।

৫. অগ্নিপূজক ও খৃস্টানদের ঈদ পালন করা, যেমন নওরোজ ও ঈদুল মিলাদ।

৬. মাযহাবের ক্ষেত্রে ব্যাপক গোপনীয়তা। তাদের আকিদা তারা কঠিনভাবে গোপন করে, অদ্ভুত পদ্ধতি ও বিশেষ উৎসবের মাধ্যমে

---

[1] ফাতিম বলতে ফাতিমাকে বুঝানো হয়েছে। তবে যেহেতু নুসাইরীদের আকীদা-বিশ্বাসে নারীদের কোনো স্বামী থাকতে নেই, তাই তারা ফাতেমাকে স্বামী থেকে বাঁচানোর জন্য ফাতিম তথা পুরুষ শব্দের ব্যবহার করে থাকে।

তারা তাদের অনুসারীদের উন্নতি দেয়, যা অনেকটা মাসূনীদের (ফ্রী ম্যাসন সংস্থার লোকদের) স্তরবিন্যাসের মত।

অধ্যয়নের জন্য মূলপাঠ

নুসাইরিদের পবিত্র কিতাব 'আল-মাজমু'র পঞ্চম সূরা। সূরাতুল ফাতহ:

﴿ إِذَا جَآءَ نَصۡرُ ٱللَّهِ وَٱلۡفَتۡحُ ۝١ وَرَأَيۡتَ ٱلنَّاسَ يَدۡخُلُونَ فِي دِينِ ٱللَّهِ أَفۡوَاجٗا ۝٢ فَسَبِّحۡ بِحَمۡدِ رَبِّكَ وَٱسۡتَغۡفِرۡهُۚ إِنَّهُۥ كَانَ تَوَّابَۢا ۝٣ ﴾ [النصر: ١، ٤]

"যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে, আর তুমি লোকদেরকে দলে দলে আল্লাহর দীনে দাখিল হতে দেখবে, তখন তুমি তোমার রবের সপ্রশংস তাসবীহ পাঠ কর এবং তার কাছে ক্ষমা চাও নিশ্চয় তিনি তওবা কবূলকারী"।[1]

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমার মাওলা আমিরুল নাহল আলী। তিনি নিজ সত্তার নূর থেকে সায়্যেদ মুহাম্মদকে সৃষ্টি করেছেন। তার নাম, তার নফস, তার আরশ, তার কুরসি ও তার সিফাৎ তার সাথে মিলিত, তার থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। অঙ্গাঙ্গীভাবে তার সাথে মিলিত নয়, আবার বিচ্ছিন্নের ন্যায় পৃথকও নয়। তার সাথে নূর মিলিত। বাহ্যত তার থেকে পৃথক, সে তার থেকে যেমন নফসের অনুভূতি নফস থেকে, অথবা সূর্যের সাথে সূর্যের রশ্মির সম্পর্কের ন্যায়, অথবা পানির সাথে পানির শব্দের সম্পর্কের ন্যায়, অথবা বন্ধ থেকে উন্মুক্ত

---

[1] সূরা নাসর: (১-৩)

করার ন্যায়, অথবা বিদ্যুতের সাথে বিদ্যুতের চমকের সম্পর্কের ন্যায়, অথবা দ্রষ্টার সাথে দৃষ্টির সম্পর্কের ন্যায়, অথবা নীরবতার সাথে নড়াচড়ার সম্পর্কের ন্যায়। যদি আলী ইবনে আবি তালিব প্রকাশ করতে চান, তাকে প্রকাশ করেন, যদি তিনি গোপন করতে চান, তাহলে তার নূরের ঝলকের নিচে তাকে গোপন করেন।

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, সায়্যেদ মুহাম্মদ সায়্যেদ সালমানকে স্বীয় নূর থেকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি তাকে স্বীয় বাব ও স্বীয় কিতাবের ধারক বানিয়েছেন, তিনি সালসাল ও সালসাবিল, তিনি জাবের ও জাবরায়িল, তিনি হিদায়েত ও ইয়াকিন, প্রকৃতপক্ষে তিনি রাব্বুল আলামীন।

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, সায়্যেদ সালমান সম্মানিত পাঁচ আইতামকে সৃষ্টি করেছেন, তাদের প্রথম হচ্ছে ইয়াতিমুল আকবার, কাওকাবুল আযহার, মিসকুল ইযফির, ইয়াকুতুল আহমার, যামরাদুল আখদার, মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ আল-কিন্দি, আবু যর আল-গিফারি, আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহাহ আল-আনসারি, উসমান ইবনে মায'উন আন-নাজ্জাসি, কুনবুর ইবনে কাদান আদ-দুসি[1], তারা সবাই আমাদের মাওলা আমিরুল মুমিনের গোলাম, তার জন্য সকল সম্মান ও মর্যাদা।

---

[1] এদের চারজন বিখ্যাত সাহাবী, বাকী কুনবুর হচ্ছে আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর দাস।

তারা (পাঁচ ইয়াতীম) এ জগতকে সৃষ্টি করেছেন সূর্যের পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত, তার কিবলাকে ও উত্তরকে, তার ভূভাগ ও জলভাগকে, তার সমতল ভূমি ও পর্বতকে, যা সবুজ ঘিরেছে ও যা ধূলি বেষ্টন করেছে, জাবলকা থেকে জাবরসা পর্যন্ত, আহকাফের প্রবেশদ্বার থেকে জাবালে কাফ পর্যন্ত, ঘূর্ণ্যমান নক্ষত্রের গম্বুজ থেকে সায়্যেদ মুহাম্মদের শহর সামুররা[1] পর্যন্ত, যেখানে সকল মুমিন জমা হয় ও সাইয়্যেদ আবু আব্দুল্লাহর সিদ্ধান্তে ঐকমত্য পোষণ করে। তারা সন্দেহ করে না, শরীকও করে না, তারা আলী ইবনে আবি তালিবের গোপন রহস্য ফাঁস করে না, তার পর্দাকে তারা ছিন্ন করে না, বাব ব্যতীত কোনো পথ দিয়ে তার নিকট প্রবেশ করে না। আপনি মুমিনকে মুমিন, নিরাপদ, তাদের শত্রুদের উপর শক্তিশালী ও আমাদের শত্রুদের উপর বিজয়ী করুন, আমাদেরকে তাদের মত মুমিন নিরাপদ অনুগত করুন, আমাদের ও তাদের শত্রুদের উপর বিজয়ী করুন। বিজয়ের রহস্যের উসিলায়, যে বিজয়কে বিজয় করেছে এবং যার ডান হাতে বিজয় ছিল তার উসিলায়। আমাদের সায়্যেদ মুহাম্মদ, ফাতিম, হাসান, হুসাইন ও মুহসিনের রহস্যের উসিলায়, অদৃশ্যের উসিলায়, সালাতের ব্যক্তিদের উসিলায়, আরেফিনদের সংখ্যার উসিলায়, তাদের আলোচনার কারণে আমাদের

[1] যে সামুররার গুহায় তাদের তথাকথিত ইমাম আত্মগোপন করে আছে।

উপর সালাম বর্ষিত হোক এবং তাদের সকলের উপর আল্লাহর সালাম বর্ষিত হোক।[1]

[1] হারাকাতুল বাতেনিয়াহ ফিল আলামিল ইসলামি, ড. মুহাম্মদ আহমদ আল-খতিব: (পৃ.৪০৪)

দ্রূয

দ্রূয বাতেনি ফেরকাসমূহের একটি ফেরকা, তবে অন্য সকল ফেরকা থেকে তারা বিচ্ছিন্ন; কারণ তারা হাকিম উবাইদির উলুহিয়াত (ইলাহ হওয়ার) আকিদা ধারণ করে, অর্থাৎ তারা মিসরের ফাতেমি শাসক খলিফা (নামধারী) হাকিম বি আমরিল্লাহকে ইলাহ বলে বিশ্বাস করে থাকে)।

তাদের বিশ্বাস, হাকিম বি আমরিল্লাহ-ই আল্লাহ, যে মানুষের আকৃতিতে অবতীর্ণ হয়েছে। (তাদের কথা থেকে আল্লাহ কতই না পবিত্র!)। এ মতবাদ প্রকাশ করে মূলত তারা শিয়া মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা আব্দুল্লাহ ইবনে সাবার পুনরাবৃত্তি করল, সে আলী ইবনে আবি তালিব সম্পর্কে এ কথাই বলেছিল।

দ্রূযদের গুরুত্বপূর্ণ আকিদা:

১. সকল দীন ও মতবাদের সাথে কুফরী করা, এবং সে সবের অনুসারীদের কাফের বলা। এ ক্ষেত্রে ইসলাম, ইয়াহূদী ও খৃস্টান সবই তাদের দৃষ্টিতে সমান। ইসলামকে তারা ইবলিসী শরীয়ত বলে। তারা বিশ্বাস করে হাকিম শেষ যুগে পুনরায় আসবেন, অতঃপর তিনি কাবা ধ্বংস, মুসলিমদের হত্যা ও তাদের উপর জিযিয়া কর আরোপ করবেন। সকল দীনের ব্যাপারে তিনি এরূপ করবেন।

২. পরকালকে অস্বীকার করা ও তাকাম্মুসের প্রতি ঈমান আনা, তাকাম্মুস[1] হিন্দুদের পুনর্জন্ম মতবাদের ন্যায় একটি মতবাদ।

৩. নবুওয়ত অস্বীকার ও সকল নবীকে মিথ্যারোপ করা, বিশেষ করে ইসলামের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে। তাদের পবিত্র কিতাবসমূহ তাকে ঘৃণিত বিশেষণে বিশেষায়িত ও খারাপ ভাষায় গালমন্দ করে, অথচ তিনি সকল খারাপি থেকে মুক্ত।

৪. বাতেনি অপব্যাখ্যা। তাদের নিকট সালাত, সিয়াম, যাকাত, হজ ও অন্যান্য ইবাদতের বিশেষ অর্থ রয়েছে, যার সাথে বাস্তবতার কোনো মিল নেই।

৫. দ্রুয বিশ্বাস করে যে, তাদের দীন ইয়াহূদীদের ন্যায় সীমাবদ্ধ, অর্থাৎ বাহির থেকে কেউ তাতে প্রবেশ করতে পারবে না, অনুরূপ তারা বিশ্বাস করে শিয়াদের তাকিয়া (সত্য কথা গোপন করে অন্যদের কাছে ভিন্নভাবে প্রকাশ করা) নীতিতে ও বাতেনিদের অনৈতিকতা ও সেচ্ছাচারিতায়।

এটা স্মরণ রাখুন, আর দ্রুযরা শামদেশে বসবাস করে, বিশেষ করে লেবাননে, ইতিহাসে তাদের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিগণ: ফখরুদ্দিন আল-মাগনি আস-সানি, বাশির আশ-শিহাবি, সুলতানুল আতরাশ ও কামাল জুনবলাত।

---

[1] তাকাম্মুস হচ্ছে কাপড় পরিধান করা। তাদের মতে আত্মা এক শরীরকে কাপড় হিসেবে গ্রহণ করে তা বাদ দিয়ে অন্য শরীর গ্রহণ করে। [সম্পাদক]

বিভিন্ন দীন ও ধর্ম

ভূমিকা: বিভিন্ন দীন ও ফিতরাত বা স্বভাবগত দীন (ইসলাম) সম্পর্কে

আল্লাহ তা‘আলা মানব জাতিকে তাওহীদ ও ইসলামের উপর সৃষ্টি করেছেন। অতএব প্রত্যেক মানুষ আদি যুগে কিংবা বর্তমান যুগে, যে দেশে কিংবা যে স্থানেই থাক, তার জন্ম হয় ইসলামের উপর। তার মধ্যে বিচ্যুতি আসে বহিরাগত কারণে, যেমন তার পিতা-মাতা ও সমাজ তাকে তাদের বাতিল দীনের উপর লালন করে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿ فَأَقِمۡ وَجۡهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفٗاۚ فِطۡرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيۡهَاۚ لَا تَبۡدِيلَ لِخَلۡقِ ٱللَّهِۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلۡقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعۡلَمُونَ ٣٠ ﴾ [الروم: ٣٠]

“অতএব তুমি একনিষ্ঠ হয়ে দীনের জন্য নিজেকে প্রতিষ্ঠিত রাখ। আল্লাহর প্রকৃতি, যে প্রকৃতির উপর তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন, আল্লাহর সৃষ্টির কোনো পরিবর্তন নেই, এটাই প্রতিষ্ঠিত দীন, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না”।[1] অপর আয়াতে তিনি বলেন:

﴿ وَإِذۡ أَخَذَ رَبُّكَ مِنۢ بَنِيٓ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمۡ ذُرِّيَّتَهُمۡ وَأَشۡهَدَهُمۡ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمۡ أَلَسۡتُ بِرَبِّكُمۡۖ قَالُواْ بَلَىٰ شَهِدۡنَآۚ أَن تَقُولُواْ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنۡ هَٰذَا غَٰفِلِينَ

[1] সূরা রূম: (৩০)

﴿ أَوۡ تَقُولُوٓاْ إِنَّمَآ أَشۡرَكَ ءَابَآؤُنَا مِن قَبۡلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةٗ مِّنۢ بَعۡدِهِمۡۖ أَفَتُهۡلِكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلۡمُبۡطِلُونَ ١٧٣ ﴾ [الاعراف: ١٧١، ١٧٢]

“আর স্মরণ কর, যখন তোমার রব বনী-আদমের পৃষ্ঠদেশ হতে তাদের বংশধরকে বের করলেন এবং তাদেরকে তাদের নিজদের উপর সাক্ষী করলেন যে, ‘আমি কি তোমাদের রব নই’? তারা বলল, ‘হ্যাঁ, আমরা সাক্ষ্য দিলাম’। যাতে কিয়ামতের দিন তোমরা বলতে না পার যে, ‘নিশ্চয় আমরা এ বিষয়ে অনবহিত ছিলাম। অথবা তোমরা যাতে বলতে না পার, ‘আমাদের পিতৃ-পুরুষরাই পূর্বে শির্ক করেছে, আর আমরা ছিলাম তাদের পরবর্তী বংশধর। সুতরাং বাতিলপন্থীরা যা করেছে, তার কারণে আপনি কি আমাদেরকে ধ্বংস করবেন”?[1]

একটি সহি হাদিসে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ»

“এমন কোনো নবজাতক নেই যে ফিতরাত বা স্বভাবজাত দীনের উপর জন্ম গ্রহণ করে না, অতঃপর তার পিতা-মাতা তাকে ইয়াহূদী অথবা খৃস্টান অথবা অগ্নিপূজক বানায়”।[2] অর্থাৎ তারাই তাকে ইয়াহূদী, খৃস্টান অথবা অগ্নিপূজক বানায়।

সুতরাং তাওহীদ এবং ইসলামই মানব জাতির প্রকৃত দীন। প্রথম মানব আদম আলাইহিস সালাম ছিলেন মুসলিম এবং তাওহীদের

---

[1] সূরা আরাফ: (৭২-৭৩)

[2] সহি মুসলিম: (২৬৫৮)

উপর, কারণ, তিনি ছিলেন নবী, তার সন্তানেরাও বহু প্রজন্ম পর্যন্ত তাওহীদের উপর ছিল, অবশেষে মৃতদের সম্মানের কারণে তাদের মাঝে শির্কের প্রাদুর্ভাব ঘটে, ফলে তারা ইবাদত করে: ওদ্দ, সুওয়া, য়াগুস, য়াউক ও নাসরকে।

এসব মাবুদ প্রকৃতপক্ষে নূহ আলাইহিস সালামের কওমের নেককার লোকদের নাম, তাদের কওম তাদেরকে মহান ও পবিত্র জ্ঞান করেছে। তাদেরকে সম্মান প্রদানের প্রকৃতি ছিল যে, তারা তাদের ছবি নির্মাণ করে, যেন তা দেখে তারা আল্লাহর ইবাদত স্মরণ করে, পরবর্তীতে তারা সেসব মূর্তির ইবাদত আরম্ভ করে এবং তাদের নিকট দো'আ করে আল্লাহ ব্যতীত।

আল্লাহ তা'আলা প্রথম রাসূল নূহ আলাইহিস সালামকে প্রেরণ করেন যেন তাদেরকে তিনি ইসলামের দিকে আহ্বান করেন, তার উপর কতক লোক ঈমান আনে এবং আল্লাহ মুশরিকদের ডুবিয়ে মারেন, যেমন সূরা নূহ ও অন্যান্য সূরা থেকে আমরা জেনেছি।

আল্লাহ তা'আলা নূহ আলাইহিস সালামের ভাষায় বলেন:

﴿وَأُمِرۡتُ أَنۡ أَكُونَ مِنَ ٱلۡمُسۡلِمِينَ ٧٢﴾ [يونس : ٧٢]

"আর আমি আদিষ্ট হয়েছি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার"।[1]

---

[1] সূরা ইউনুস: (৭২)

এরূপই ছিল প্রত্যেক নবী, যারা তার পরবর্তীতে এসেছে। তারা এসেছেন কওমকে ইসলাম ও তাওহীদের দিকে আহ্বান করার জন্যে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِيٓ إِلَيۡهِ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعۡبُدُونِ ٢٥ ﴾ [الانبياء: ٢٥]

"আর তোমার পূর্বে এমন কোনো রাসূল আমরা পাঠাইনি যার প্রতি আমরা এই ওহী নাযিল করেনি যে, 'আমি ছাড়া কোনো (সত্য) ইলাহ নেই। সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদত করো"।[1]

আল্লাহ তা'আলা আরও উল্লেখ করেছেন যে, প্রত্যেক নবী তার কওমকে বলেছেন:

﴿ يَٰقَوۡمِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنۡ إِلَٰهٍ غَيۡرُهُۥٓ ٥٩ ﴾ [الاعراف: ٥٨]

"হে আমার কওম, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, তিনি ছাড়া তোমাদের কোন (সত্য) ইলাহ নেই"।[2]

নবীদের মধ্যে একজন মহান নবী হলেন ইবরাহীম খলিল 'আলাইহিস সালাম, আল্লাহ তার সম্পর্কে বলেন:

﴿ مَا كَانَ إِبۡرَٰهِيمُ يَهُودِيّٗا وَلَا نَصۡرَانِيّٗا وَلَٰكِن كَانَ حَنِيفٗا مُّسۡلِمٗا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ ٦٧ ﴾ [ال عمران: ٦٧]

---

[1] সূরা আম্বিয়া: (২৫)

[2] সূরা আরাফ: (৫৯)

“ইবরাহীম ইয়াহূদীও ছিল না, নাসারাও ছিল না, বরং সে ছিল একনিষ্ঠ মুসলিম। আর সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না”।[1] তিনি তার পরবর্তী সকল নবীর পিতা।

অনুরূপ আল্লাহর নবী মূসা ‘আলাইহিস সালাম মুসলিম ছিলেন, তিনি তার কওমকে ইসলামের দিকে আহ্বান করেছেন। এ জন্য ফিরআউন বলেছিল, যখন তাকে নিমজ্জন গ্রাস করে:

﴿ حَتَّىٰٓ إِذَآ أَدۡرَكَهُ ٱلۡغَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا ٱلَّذِيٓ ءَامَنَتۡ بِهِۦ بَنُوٓاْ إِسۡرَٰٓءِيلَ وَأَنَا۠ مِنَ ٱلۡمُسۡلِمِينَ ٩٠ ﴾ [يونس : ٩٠]

“অবশেষে যখন সে ডুবে যেতে লাগল, তখন বলল, ‘আমি ঈমান এনেছি যে, সে সত্তা ছাড়া কোনো মাবূদ নেই, যার প্রতি বনী ইসরাইল ঈমান এনেছে। আর আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত”।[2] ঈসা আলাইহিস সালামের কওমও অনুরূপ বলেছে:

﴿ وَإِذۡ أَوۡحَيۡتُ إِلَى ٱلۡحَوَارِيِّـۧنَ أَنۡ ءَامِنُواْ بِي وَبِرَسُولِي قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَٱشۡهَدۡ بِأَنَّنَا مُسۡلِمُونَ ١١١ ﴾ [المائدة: ١١١]

“আর যখন আমি হাওয়ারীগণকে এ আদেশ দিয়েছিলাম যে, ‘আমার প্রতি তোমরা ঈমান আন ও আমার রাসূলের প্রতি’। তারা বলেছিল, ‘আমরা ঈমান আনলাম’ এবং আপনি সাক্ষী থাকুন যে, আমরা

---

[1] সূরা আলে-ইমরান: (৬৭)

[2] সূরা ইউনুস: (৯০)

অবশ্যই মুসলিম”।[1] হাওয়ারীগণ হচ্ছেন ঈসা আলাইহিস সালামের সাথী ও সাহাবিগণ।

অতএব প্রত্যেক নবী তার কওমকে ইসলামের দিকে আহ্বান করেছেন, ইসলাম হচ্ছে আল্লাহর একমাত্র দীন, যা ব্যতীত তিনি কিছুই গ্রহণ করবেন না। আল্লাহ বলেন:

﴿ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلۡإِسۡلَٰمُۗ ﴾ [ال عمران: ١٩]

“নিশ্চয় আল্লাহর নিকট দীন হচ্ছে ইসলাম”।[2] তিনি আরো বলেন:

﴿ وَمَن يَبۡتَغِ غَيۡرَ ٱلۡإِسۡلَٰمِ دِينٗا فَلَن يُقۡبَلَ مِنۡهُ وَهُوَ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ ﴾ [ال عمران: ٨٥]

“আর যে ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দীন চায়, তবে তার কাছ থেকে তা গ্রহণ করা হবে না এবং সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে”।[3] নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

«وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ يَهُودِيٌّ، وَلَا نَصْرَانِيٌّ، ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ»

“সে সত্তার কসম যার হাতে মুহাম্মদের নফস, এ উম্মত থেকে কোনো ইয়াহূদী, অথবা কোনো নাসারা আমার সম্পর্কে শুনে,

---

[1] সূরা মায়েদাহ: (১১১)

[2] সূনা আলে-ইমরান: (১৯)

[3] সূরা আলে-ইমরান: (৩৮)

অতঃপর সে মারা যায় আমি যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছি তার উপর ঈমান আনা ব্যতীত, অবশ্যই সে জাহান্নামী।[1]

আল্লাহ তা'আলা উম্মতে মুহাম্মদীকে ইসলাম নাম দিয়ে সম্মান করেছেন:

﴿هُوَ سَمَّىٰكُمُ ٱلۡمُسۡلِمِينَ مِن قَبۡلُ ۝٧٨﴾ [الحج: ٧٨]

“তিনিই তোমাদের নাম রেখেছেন মুসলিম ইতোপূর্বে”।[2] কারণ তার রিসালাত হচ্ছে ব্যাপক রিসালাত সকল মানব জাতির জন্য এবং তার উম্মতই সবেচয়ে বড় উম্মত ইসলামের অর্থ ও পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ বাস্তবায়ন করার জন্যে।

এ আলোচনার সারাংশ:

১. ইসলাম হচ্ছে মানুষের স্বভাবজাত ধর্ম, তার উপর পৃথিবীর বুকে প্রত্যেক নবজাতক জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু বিচ্যুতিপূর্ণ ও বাতিল দীক্ষা তাকে অন্যান্য ধর্ম লালনে উদ্বুদ্ধ করে।

২. ইসলাম মানব জাতির প্রথম দীন এবং প্রত্যেক নবী ইসলাম ও তাওহীদের দিকে আহ্বানকারী মুসলিম ছিলেন।

৩. ইসলাম ব্যতীত ইয়াহূদী, নাসরানি, অগ্নিপূজক, হিন্দু ও অন্য সকল ধর্ম আল্লাহর সে দীন নয়, যা দিয়ে তিনি রাসূল প্রেরণ ও কিতাব নাযিল করেছেন, আল্লাহ তার কিছুই গ্রহণ করবেন না, যে

---

[1] মুসলিম: (২৪০)

[2] সূরা হজ: (৭৮)

এসব ধর্ম পালন করবে তাদের ঠিকানা চিরস্থায়ী জাহান্নাম ও ঘৃণিত স্থান।

৪. ইসলাম ব্যতীত সকল ধর্ম পাদ্রি, সন্ন্যাসী, গণক, ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব ও দার্শনিকদের রচিত ও তৈরিকৃত। তারা নিজেদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন দীন রচনা করেছে, অথবা আল্লাহর দীনকে পরিবর্তন, তাতে বৃদ্ধি ও হ্রাস করেছে, যার ফলে বাতিলের স্তূপে প্রকৃত দীন বিনষ্ট হয়েছে।

ইয়াহূদী ধর্ম

ইয়াহূদী ধর্ম হচ্ছে বনু ইসরাইলের (তৈরী করা) দীন, যাদের মাঝে আল্লাহ তা'আলা মূসা আলাইহিস সালামকে প্রেরণ করেন এবং তাকে তাওরাত প্রদান করেন।

মূসা 'আলাইহিস সালাম বনু ইসরাইলকে তাওহীদ ও ইসলামের দিকে আহ্বান করেন ও তার উপর তাদের প্রতিপালন করেন, কিন্তু তারা তার থেকে বিচ্যুত হয় ও তাদের রবের প্রকৃত কিতাব পরিবর্তন করে, ফলে তাদের ধর্মকে ইয়াহূদী ধর্ম বলা হয়।

অতএব ইয়াহূদী ধর্মের সংজ্ঞা হচ্ছে, "বিকৃত দীন, নবী মূসা আলাইহিস সালাম যে ইসলাম নিয়ে এসেছেন তা ত্যাগ করে বনু ইসরাইল যা মেনে আসছে তাই ইয়াহূদী ধর্ম"।

মূসা 'আলাইহিস সালামের যুগে ইয়াহূদী ধর্ম:

মূসা আলাইহিস সালামের কওমের একটি সম্প্রদায় মুমিন ছিল, তবে বনু ইসরাইলের অনেকের মাঝে তার যুগেই বিচ্যুতি ও প্রবৃত্তি পূজা দেখা যায়, যেমন:

১. আল্লাহ তা'আলা ফিরআউন ও তার কওমের দাসত্ব থেকে বনু ইসরাইলকে মুক্তি দেন, তাদের জন্য তিনি নদীতে রাস্তা তৈরি করেন, অতঃপর সে রাস্তা দু দিক থেকে মিলিয়ে দিয়ে তিনি তাদের শত্রুদেরকে ডুবিয়ে মারেন, এতদসত্ত্বেও তারা নিজেদের উপর

আল্লাহর তাওহীদ ও স্বাধীনতার নিয়ামতের সম্মান করে নি, বরং অতিদ্রুত শির্কে প্রত্যাবর্তন করতে চাইল একটি মুশরিক জাতিকে দেখে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ وَجَٰوَزۡنَا بِبَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ ٱلۡبَحۡرَ فَأَتَوۡاْ عَلَىٰ قَوۡمٖ يَعۡكُفُونَ عَلَىٰٓ أَصۡنَامٖ لَّهُمۡۚ قَالُواْ يَٰمُوسَى ٱجۡعَل لَّنَآ إِلَٰهٗا كَمَا لَهُمۡ ءَالِهَةٞۚ قَالَ إِنَّكُمۡ قَوۡمٞ تَجۡهَلُونَ ١٣٨ ﴾ [الاعراف: ١٣٧]

"আর আমি বনী ইসরাইলকে সমুদ্র পার করিয়ে দিলাম। অতঃপর তারা আসল এমন এক কওমের কাছে যারা নিজেদের মূর্তিগুলোর পূজায় রত ছিল। তারা বলল, 'হে মূসা, তাদের যেমন উপাস্য আছে আমাদের জন্য তেমনি উপাস্য নির্ধারণ করে দিন। তিনি বললেন, 'নিশ্চয় তোমরা এমন এক কওম যারা মূর্খ"।[1]

২. বনু ইসরাইল মূসা আলাইহিস সালামকে বলেছে:

﴿ وَإِذۡ قُلۡتُمۡ يَٰمُوسَىٰ لَن نُّؤۡمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهۡرَةٗ فَأَخَذَتۡكُمُ ٱلصَّٰعِقَةُ وَأَنتُمۡ تَنظُرُونَ ٥٥ ﴾ [البقرة: ٥٥]

"আর যখন তোমরা বললে, 'হে মূসা, আমরা তোমার প্রতি ঈমান আনব না, যতক্ষণ না আমরা প্রকাশ্যে আল্লাহকে দেখি'। ফলে বজ্র

---

[1] সূরা আরাফ: (১৩৮)

তোমাদেরকে পাকড়াও করল আর তোমরা তা দেখছিলে”।[1] বস্তুত তাদেরকে বিকট শব্দ আক্রমণ করেছিল যা তারা প্রত্যক্ষ করছিল।

৩. আল্লাহ তা‘আলা তাদের নবী মূসা আলাইহিস সালামের জবানে তাদেরকে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ ও পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ করার নির্দেশ দেন, কিন্তু তারা আল্লাহর নির্দেশকে ছুড়ে মারে ও বলে:

﴿ فَٱذۡهَبۡ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَٰتِلَآ إِنَّا هَٰهُنَا قَٰعِدُونَ ﴿٢٤﴾ ﴾ [المائدة: ٢٤]

“সুতরাং তুমি ও তোমার রব যাও এবং লড়াই কর, আমরা তো এখানেই বসে রইলাম”।[2]

৪. আল্লাহ তা‘আলা সবচেয়ে সুস্বাদু ও পবিত্র খাবার মান্না ও সালওয়া তাদের দান করেন, কিন্তু তারা মূসা আলাইহিস সালামের নিকট তার রবকে আহ্বান করার অনুরোধ করেন, যেন তিনি তাদের জন্য জমিনে উৎপাদিত শস্য বের করেন, যেমন তরকারি, কাঁকড়ি, গম, মসুর ডাল ও পেঁয়াজ।

৫. মূসা আলাইহিস সালাম তাওরাত গ্রহণ করার জন্যে তার রবের নিকট গমন করেন, তাদের থেকে মাত্র চল্লিশ রাত তিনি অনুপস্থিত থাকেন, তিনি ফিরে এসে দেখেন তারা স্বর্ণের তৈরি গো বৎসের পূজা করছে। তারা বলত: এটা আমাদের ও মূসার ইলাহ, তারা

---

[1] সূরা বাকারা: (৫৫)

[2] সূরা মায়েদা: (২৪)

হারুনকে প্রত্যাখ্যান করে গো বৎসের মালিক সামেরির অনুসরণ করে।

মূসা আলাইহিস সালামের মৃত্যুর পর তাদের নিকট ক্রমান্বয়ে নবীগণ আগমন করেন তাদেরকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনা ও তাদের মাঝে তাওরাত কায়েম করার নিমিত্তে, কিন্তু তারা নবীদের অস্বীকার করে, বরং তাদেরকে জেদ এতটা উগ্র করেছে যে, তারা কতক নবীকে পর্যন্ত হত্যা করেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ أَفَكُلَّمَا جَآءَكُمۡ رَسُولُۢ بِمَا لَا تَهۡوَىٰٓ أَنفُسُكُمُ ٱسۡتَكۡبَرۡتُمۡ فَفَرِيقٗا كَذَّبۡتُمۡ وَفَرِيقٗا تَقۡتُلُونَ ٨٧ ﴾ [البقرة: ٨٧]

"তবে কি তোমাদের নিকট যখনই কোনো রাসূল এমন কিছু নিয়ে এসেছে, যা তোমাদের মনঃপূত নয়, তখন তোমরা অহংকার করেছ, অতঃপর (নবীদের) একদলের উপর তোমরা মিথ্যারোপ করেছ আর একদলকে হত্যা করেছ"।[1]

আর তাদের হাত আল্লাহর কিতাবকে বিকৃত করে, এমন কি তাতে শির্ক ও কুফর পর্যন্ত দাখিল করে।

তাওরাত:

[1] সূরা বাকারা: (৮৭)

তাওরাত সে কিতাবের নাম, যা আল্লাহ তার নবী মূসা আলাইহিস সালামের উপর নাযিল করেন। এটা আসমান থেকে নাযিলকৃত অন্যান্য কিতাবের মত তাওহীদ, আহকাম ও আখলাক সমৃদ্ধ ছিল, যার উপর মানুষের জীবন নির্ভরশীল, যার অনুসরণ ও যা আঁকড়ে থাকার উপর তাদের দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতা ও কামিয়াবি নির্ভরশীল ছিল।

কিন্তু ইয়াহূদীরা তাওরাত ও তার অর্থ বিকৃত করে, তাওহীদ ও ঈমানকে পরিবর্তন করে, যেমন পরিবর্তন করে শরীয়ত ও বিধানকে এবং তাতে তাদের ইতিহাস ও দীর্ঘ যুগের বৃত্তান্ত দাখিল করে তারা, ফলে বর্তমান তাওরাত বনু ইসরাইলের অবস্থা, যুদ্ধবিগ্রহ ও তাদের শাসনের ইতিহাস গ্রন্থে পরিণত হয়, যাতে রয়েছে প্রচুর বাতুলতা, অপছন্দ ঘটনা, বিকৃতি ও ব্যাপক বাগড়ম্বর।

তাওরাতে তাদের বিকৃতি ও পরিবর্তনের নমুনা:

১. শব্দ বিকৃত করা, অর্থাৎ আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তাতে পরিবর্তন করা, অথবা তাতে বর্ধিত করা, অথবা তাতে হ্রাস করা। আল্লাহ তা'আলা তাদের যাজকদের সম্পর্কে বলেন:

﴿ فَوَيۡلٞ لِّلَّذِينَ يَكۡتُبُونَ ٱلۡكِتَٰبَ بِأَيۡدِيهِمۡ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنۡ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشۡتَرُواْ بِهِۦ ثَمَنٗا قَلِيلٗاۖ فَوَيۡلٞ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتۡ أَيۡدِيهِمۡ وَوَيۡلٞ لَّهُم مِّمَّا يَكۡسِبُونَ ٧٩ ﴾ [البقرة: ٧٩]

“সুতরাং ধ্বংস তাদের জন্য যারা নিজ হাতে কিতাব লিখে। তারপর বলে, ‘এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে’, যাতে তা তুচ্ছ মূল্যে বিক্রি করতে পারে। সুতরাং তাদের হাত যা লিখেছে তার পরিণামে তাদের জন্য ধ্বংস, আর তারা যা উপার্জন করেছে তার কারণেও তাদের জন্য ধ্বংস”।[1]

২. অর্থ বিকৃত করা, অর্থাৎ বাক্যকে তার প্রকৃত অর্থ থেকে অন্য অর্থে ব্যবহার করা তাদের স্বভাব ছিল। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿ يُحَرِّفُونَ ٱلۡكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِۦ ١٣ ﴾ [المائدة: ١٣]

“তারা শব্দগুলোকে আপন স্থান থেকে বিকৃত করে”।[2] অপর স্থানে তিনি বলেন:

﴿ يُحَرِّفُونَ ٱلۡكَلِمَ مِنۢ بَعۡدِ مَوَاضِعِهِۦۖ ٤١ ﴾ [المائدة: ٤١]

“তারা শব্দগুলোকে যথাযথ সুবিন্যস্ত থাকার পরও আপন স্থান থেকে বিকৃত করে”।[3]

এর একটি উদাহরণ হচ্ছে, বর্তমান তাওরাতে রয়েছে চুরি, সুদ, যিনা ও ধোঁকা শুধু ইয়াহূদীদের মাঝে হারাম, তবে অন্যদের সাথে তাদের জন্য এসব কর্ম হালাল।

---

[1] সূরা বাকারা: (৭৯)

[2] সূরা মায়েদাহ: (১৩)

[3] সূরা মায়েদাহ: (৪১)

৩. তাদের স্বভাব ছিল কতক অংশ প্রকাশ করা ও কতক অংশ গোপন করা, আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ قُلْ مَنْ أَنزَلَ ٱلْكِتَٰبَ ٱلَّذِى جَآءَ بِهِۦ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لِّلنَّاسِ ۖ تَجْعَلُونَهُۥ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا ۖ وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوٓا۟ أَنتُمْ وَلَآ ءَابَآؤُكُمْ ۖ ﴿٩١﴾ ﴾ [الانعام: ٩١]

"বল, 'কে নাযিল করেছে সে কিতাব, যা মূসা নিয়ে এসেছে মানুষের জন্য আলো ও পথনির্দেশস্বরূপ, তোমরা তা বিভিন্ন কাগজে লিখে রাখতে, তোমরা তা প্রকাশ করতে আর অনেক অংশ গোপন রাখতে, আর তোমাদেরকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল যা জানতে না তোমরা ও তোমাদের পিতৃপুরুষ"?[1]

তাওরাতে তারা যেসব বিষয় গোপন ও আড়াল করেছে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওতের নিদর্শন, তাকে সত্যারোপ করা ও তার প্রতি ঈমান আনার নির্দেশ সম্বলিত আয়াত।

তাওহীদ ও আকিদার ক্ষেত্রে কতক বিকৃতি:

প্রথমত: আল্লাহর জন্য উপমা ও সাদৃশ্য নির্ধারণ করা: আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِۦ شَىْءٌ ۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿١١﴾ ﴾ [الشورى: ١١]

---

[1] সূরা আনআম: (৯১)

“তার মত কিছু নেই, আর তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা”।[1]

সকল আসমানি কিতাব, সুস্থ বিবেক ও মানুষের স্বাভাবিক প্রকৃতি বা ফিতরাত এ ব্যাপারে একমত যে, আল্লাহর সৃষ্টিজীব থেকে কোনো বস্তু তার মত ও তার সাথে সদৃশ নেই। কিন্তু ইয়াহূদীরা তাদের বিকৃত তওরাতকে এ জাতীয় অনেক কুফরি দ্বারা ভরে ফেলেছে, এখানে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ উল্লেখ করছি:

১. তারা লিখেছে আল্লাহ তা‘আলা সাত দিনে আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেন, অতঃপর সপ্তম দিনে তিনি বিশ্রাম নেন।

২. তাওরাতে তারা লিখেছে, আল্লাহ যখন মানুষ সৃষ্টি করলেন এবং দেখলেন যে, তার অনিষ্ট জমিনে ব্যাপক আকার ধারণ করেছে, তখন তিনি মানুষ সৃষ্টির জন্য দুঃখিত হন এবং অন্তরে আফসোস করেন।

৩. তারা আরো লিখেছে, আল্লাহ তা‘আলা জমিনে অবতরণ করেন এবং ইয়াকুবের সাথে সন্ধ্যা থেকে ফজর পর্যন্ত কুস্তি লড়েন। (আল্লাহ তাদের এ সব কথা থেকে অনেক উর্ধ্বে)

দ্বিতীয়ত: নবীদের কলঙ্কিত করা:

ইয়াহূদীদের নাপাক প্রকৃতি নবীদের সাথে কালিমা ও অশ্লীলতা লেপন করতে কুণ্ঠাবোধ করে নি, এভাবে তারা নিজেদের অশ্লীলতা

---

[1] সূরা শু‘আরা: (১১)

ও ধ্বংসাত্মক কাজগুলোকে বৈধতা দিতে চায়, বিকৃত তাওরাতে এরূপ অনেক কিছু রয়েছে, যেমন:

১. নূহ মদ পান করেন, মাতাল হন ও বস্ত্রহীন হয়ে পড়েন।

২. লুতের দুই মেয়ে তার বাবাকে মদ পান করান, তার সাথে শয়ন করেন এবং তার থেকে তারা গর্ভ ধারণ করেন।

৩. দাউদ তার ঘরের ছাদ থেকে একজন সুন্দরী নারী দেখেন, তাকে ধরে আনেন ও তার সাথে যিনা করেন এবং নারীটি তার থেকে গর্ভবতী হয়। তিনি তার স্বামীকে মৃত্যুর জন্য যুদ্ধে প্রেরণ করেন, যখন তার স্বামী মারা যায়, দাউদ তাকে বিয়ে করেন। অতঃপর তিনি তওবা করেন ও লজ্জিত হন, কিন্তু নারীকে নিজের কাছেই রাখেন এবং তার থেকেই সুলাইমানের জন্ম হয়।

৪. সুলাইমান তার মুশরিক নারীদের প্রতি ঝুঁকে যান, তিনি তাদের মূর্তির ভাস্কর্য নির্মাণ করেন, যেন তারা তার ইবাদত করে। সুলাইমান নিজেও তাতে কুরবানি পেশ করে তার নৈকট্য হাসিল করে।

তৃতীয়ত: ইয়াহূদীরা তাওরাত থেকে আখিরাত, পুনরুত্থান ও হিসাব-নিকাশের সকল বর্ণনা মুছে ফেলে, বিকৃত তাওরাত থেকে:

অধ্যায়নের জন্য মূল পাঠ

পাঠের বিষয়: মূসার মৃত্যু ও সেদিন তিনি বনি ইসরাইলকে যা বলেছেন।

বিকৃত তাওরাত বলে: “সেদিন মূসাকে রব বলেন: আবারীম মাউন্টে চড়, এ হচ্ছে মোয়াব দেশের নবো মাউন্ট, যা জেরিকোর সম্মুখে অবস্থিত। কিনানের জমিন দেখ, বনু ইসরাইলকে তা আমি রাষ্ট্র হিসেবে দান করব, তুমি যে পাহাড়ে চড়ছ তাতে মৃত্যু বরণ কর এবং তোমার কওমের সাথে মিল, যেমন তোমার ভাই হারুন হোর মাউন্টে মরে তার কওমের সাথে মিলেছে”।

অতঃপর তাওরাত বলে: “অতএব রবের কথানুসারে আব্দুর রব মূসা মোয়াব ভূমিতে মারা যান এবং তাকে পিয়োরের ঘরের সামনে মোয়াব ভূ-খণ্ডের প্রশস্ত জায়গায় দাফন করা হয়। কোনো মানুষ আজ পর্যন্ত তার কবরের সন্ধান পায় নি, মূসা যখন মারা যান তখন তার বয়স হয়েছিল এক শো বিশ বছর। তার চোখ বন্ধ হয় নি এবং তার সজীবতাও ম্লান হয় নি। মূসার জন্য বনু ইসরাইল ত্রিশ দিন ক্রন্দন করে। অতঃপর মূসার মত কোনো নবী বনু ইসরাইলে আসে নি”।[1]

প্রত্যেক বিবেকবান মানুষ জানে আল্লাহ মূসার উপর যে কিতাব নাযিল করেছেন তার অংশ এসব বিষয় নয়, বরং এগুলো কোনো ঐতিহাসিক মূসার মৃত্যুর অনেক পরে লিখেছে।

তালমুদ:

---

[1] আল-কিতাবুল মুকাদ্দাস, সর্বশেষ সফর আত-তাসনিয়াহ।

তালমুদ হচ্ছে ইয়াহূদীদের বিপজ্জনক কিতাব, যার থেকে তারা তাদের শিক্ষা ও আদর্শকে গ্রহণ করে। আধুনিক ক্রুসেডের চিন্তা ও মতবাদের উৎস এ কিতাব। তাদের পাদরি ও পণ্ডিতগণ পালাক্রমে বিভিন্ন যুগে এ কিতাব লিখেন, তার কতক শিক্ষা খুব রহস্যাবৃত ও প্রতীকসর্বস্ব, যা তাদের ব্যতীত কেউ জানে না এবং তারা ছাড়া কেউ তার ব্যাখ্যা করতে সামর্থ্য নয়।

তালমুদ আল্লাহর উপর অপবাদ, তার দীন পরিবর্তন ও তার শরীয়ত বিকৃতিতে ভরপুর। আমরা তার বিকৃতির নমুনাস্বরূপ এখানে কতক মৌলিক নীতি উল্লেখ করব, যা ইয়াহূদী ও অন্যান্য মানুষের সাথে তাদের দ্বৈত নীতির প্রমাণ। একটি প্রতিবেদন:

ক্র.	ইয়াহূদী	উম্মি বা গায়রে ইয়াহূদী
১	ইয়াহূদীরা আল্লাহর উপাদান থেকে সৃষ্ট।	উম্মিরা পশুদের বীর্য থেকে সৃষ্ট এবং তাদের রূহ শয়তানের পক্ষ থেকে।
২	তারা আল্লাহর মনোনীত জাতি	তারা গাধা, তাদেরকে আল্লাহ মনোনীত জাতির সেবার জন্য সৃষ্টি করেছেন।
৩	তাদের বিবাহ একমাত্র শরয়ী বিবাহ।	উম্মিদের বিবাহের কোনো বৈধতা নেই, তাই তারা তাদের মা-বাবার সাথে কোনো মানবিক সম্পর্ক রাখে

		না।
৪	ইয়াহূদীর সাথে ইয়াহূদী নারীর যিনা হারাম।	ইয়াহূদী ব্যতীত সকল নারী নাপাক, তাদের সাথে ইয়াহূদীর যিনা পাপের কোনো অনুভূতি জাগ্রত করে না।
৫	ইয়াহূদীর জন্য ইয়াহূদী নারীর পবিত্রতা নষ্ট করা হারাম।	ইয়াহূদীর জন্য উম্মি বা গায়রে ইয়াহূদী নারীর পবিত্রতা নষ্ট করা হারাম নয়, তবে শর্ত হচ্ছে সে নারীর বয়স তিন বছরের চেয়ে একদিন হলেও বেশি হওয়া জরুরি।
৬	অবৈধভাবে তাদের সম্পদ খাওয়া হারাম।	যেভাবে এবং যতটুকু সম্ভব গায়রে ইয়াহূদীর সম্পদ দখল কর। এটা ইয়াহূদী ধর্মের দাবিও বটে।
৭	তাদের মাঝে রেবা বা সুদ হারাম, তবে সামান্য হলে বৈধ।	ইয়াহূদীর জন্য গায়রে ইয়াহূদীর সুদ হালাল, যত বেশি হোক সমস্যা নেই।
৮	ইয়াহূদীর জন্য ইয়াহূদীকে হত্যা করা হারাম।	যে ইয়াহূদী গায়রে ইয়াহূদীকে হত্যা করে, সে মূলত রবের নিকট কুরবানি পেশ করে।
৯	ইয়াহূদীদের জন্য ইয়াহূদীর ওয়াদা ও	গায়রে ইয়াহূদীর সাথে চুক্তি, কসম অথবা অঙ্গীকারের ক্ষেত্রে ইয়াহূদী

	চুক্তির মেয়াদ পুরো করা ওয়াজিব।	সর্বদা স্বাধীন।
১০	তাদের জবাই করা পশু হালাল।	উম্মিদের জবাই করা পশু মৃত ও ডাস্টবিনে ফেলার উপযুক্ত, তারা যেভাবে জবাই করুক।

নাসারা বা খৃস্টান

পূর্বে বলেছি যে, সকল রাসূল তাওহীদ নিয়ে এসেছেন, তাদের মধ্যে ঈসা ইবনে মারয়াম অন্যতম, তাকে আল্লাহ বনি ইসরাইলের নিকট প্রেরণ করেন। আল্লাহ তাকে মূসা আলাইহিস সালাম ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দু'টি বড় দু'টি রিসালাতের মাঝে যোগসূত্র হিসেবে প্রেরণ করেন:

১. প্রথমত ঈসা আলাইহিস সালামের সম্পর্ক মূসা 'আলাইহিস সালামের রিসালাতের সাথে, যেমন আল্লাহ তাকে বনি ইসরাইলের জন্য খাসভাবে প্রেরণ করেন, তাকে তাওরাতের সত্যারোপকারী ও মূসা আলাইহিস সালামের শরীয়তের সংস্কারক বানান।

২. দ্বিতীয়ত ঈসা আলাইহিস সালামের সম্পর্ক মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাতের সাথে, যিনি জগতের জন্য রহমতস্বরূপ, ঈসা আলাইহিস সালাম তার নাম ও সিফাতসহ আগাম সংবাদ প্রদান করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ وَإِذۡ قَالَ عِيسَى ٱبۡنُ مَرۡيَمَ يَٰبَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيۡكُم مُّصَدِّقٗا لِّمَا بَيۡنَ يَدَيَّ مِنَ ٱلتَّوۡرَىٰةِ وَمُبَشِّرَۢا بِرَسُولٖ يَأۡتِي مِنۢ بَعۡدِي ٱسۡمُهُۥٓ أَحۡمَدُۖ فَلَمَّا جَآءَهُم بِٱلۡبَيِّنَٰتِ قَالُواْ هَٰذَا سِحۡرٞ مُّبِينٞ ٦ ﴾ [الصف: ٦]

"আর যখন মারয়াম পুত্র ঈসা বলেছিল, 'হে বনী ইসরাইল, নিশ্চয় আমি তোমাদের নিকট আল্লাহর রাসূল। আমার পূর্ববর্তী তাওরাতের

সত্যায়নকারী এবং একজন রাসূলের সুসংবাদদাতা যিনি আমার পরে আসবেন, যার নাম আহমদ’। অতঃপর সে যখন সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ নিয়ে আগমন করল, তখন তারা বলল, ‘এটাতো স্পষ্ট জাদু”।[1]

ঈসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তা‘আলা স্পষ্ট দলিল ও অকাট্য প্রমাণসহ বনি ইসরাইলের নিকট প্রেরণ করেন। তাদের মাঝে আল্লাহর বিধান মোতাবিক ফয়সালা করার জন্য তিনি তার উপর ইঞ্জিল নাযিল করেন। ঈসা আলাইহিস সালামের অনুসারীরা মূলত ইয়াহূদী জাতির একটি অংশ ছিল, আর ইয়াহূদীরা ছিল রোম সম্রাজ্যের অনুগত জাতিসমূহের একটি জাতি।

ঈসার অনুসারীদের দমন-পীড়ন:

ইয়াহূদীরা ঈসার রিসালাতকে কঠিনভাবে অস্বীকার করে, তাকে খুব খারাপ অপবাদ দেয়, তাকে ও তার সাথী যারা ইয়াহূদী থেকে তার অনুসারী হয়েছে তাদেরকে তারা হত্যার ষড়যন্ত্র করে, । তারা রোম শাসকের নিকট ঈসা আলাইহি সালামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে, যার ফলে হত্যার উদ্দেশ্যে শাসক তাকে গ্রেফতার ও শূলে চড়াতে উদ্বুদ্ধ হয়, কিন্তু আল্লাহ তাকে মুক্তি দেন ও উপরে তাকে উঠিয়ে নেন, আর মুনাফিক গোয়েন্দার উপর তার সাদৃশ্য নাযিল করেন, ফলে

---

[1] সূরা সাফ: (৬)

রোম শাসক তাকেই ক্রুশে চড়ায়। আল্লাহ তা'আলা মাসীহ সম্পর্কে বলেন:

﴿ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْۚ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُوا۟ فِيهِ لَفِى شَكٍّ مِّنْهُۚ مَا لَهُم بِهِۦ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا ٱتِّبَاعَ ٱلظَّنِّۚ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًۢا ﴿١٥٧﴾ ﴾ [النساء : ١٥٧]

"অথচ তারা তাকে হত্যা করেনি এবং তাকে ক্রুশে চড়ায়নি, বরং তাদেরকে ধাঁধায় ফেলা হয়েছিল। আর নিশ্চয় যারা তাতে মতবিরোধ করেছিল, অবশ্যই তারা তার ব্যাপারে সন্দেহের মধ্যে ছিল। ধারণার অনুসরণ ছাড়া এ ব্যাপারে তাদের কোন জ্ঞান নেই। আর এটা নিশ্চিত যে, তারা তাকে হত্যা করে নি"।[1]

রোম শাসকরা প্রায় তিন শতাব্দী যাবত ইয়াহূদীদের প্ররোচনা ও সহায়তায় ঈসা আলাইহিস সালামের অনুসারীদের বিভিন্ন শাস্তি দেয়, কখনো হত্যা করে, যা খৃস্টান ইতিহাসে অনেক ঘটনা ও পরিণতির জন্ম দেয়, তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে:

১. আল্লাহর নাযিলকৃত ইঞ্জিল খোয়া যাওয়া। আর যারা সে ইঞ্জিলে ঈমান এনেছিল তাদের শতধা বিচ্ছিন্ন হওয়া। এ পরিস্থিতির ফলে ঈসার অনুসারী অনেকে তার থেকে গোপনে শুনা ও পৌঁছা কথা সত্যাসত্য যাচাই ছাড়া লিপিবদ্ধ করে। এ লিপিগুলোই পরবর্তীতে বিবিধ ইঞ্জিল নামে অভিহিত হতে থাকে।

---

[1] সূরা নিসা: (১৫৭)

২. অদ্ভুত মতবাদ ও চিন্তা প্রকাশ করে মিথ্যা ও অমূলক ধারণাসমূহ ঈসার সাথে সম্পৃক্ত করা হয়। ঈসার অনুসারীদের পক্ষে সম্ভব ছিল না এ কঠোর দমন-পীড়ন অবস্থায় তার প্রতিবাদ করা কিংবা সেসব মতবাদ যে মিথ্যা তা যথাযথভাবে খণ্ডানো।

কঠিন সেই পরিস্থিতিতে যেসব মতবাদ তৈরি হয় তার মাঝে শৌল, যার আরেক উপাধি 'পল', তার মতবাদটি অধিক প্রসিদ্ধি লাভ করে।

পল:

খৃস্টান ও সমসাময়িক অন্যান্য গবেষক ও ঐতিহাসিকগণ প্রায় একমত যে, বর্তমানে পরিচিত খৃস্ট ধর্মের প্রকৃত প্রবর্তক হচ্ছে 'পল'।

এতে কোনো দ্বিমত নেই যে, ইয়াহূদীদের মধ্যে 'পল' প্রথম অবস্থায় ঈসার উপর ঈমান আনয়নকারী মুমিনদের সাথে শত্রুতা ও তাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণে সবচেয়ে কঠিন ছিল। খোদ পলের পত্রাবলিতে তা লিখিত রয়েছে। কিন্তু সে হঠাৎ খৃস্ট-ধর্মে দীক্ষিত হয় ও তা গ্রহণ করে এবং সে বড় রাসূলে পরিণত হয়, যেমন তার সম্পর্কে তারা বলে থাকে।

প্রকৃতপক্ষে তার খৃস্টান হওয়া সুদূর প্রসারী ইয়াহূদী চক্রান্তের অংশ ছিল, সে ভেতর থেকে খৃস্টান ধর্ম ধ্বংস করা শুরু করে, যা ইচ্ছা তাই সে রহিত করে এবং যা ইচ্ছা তা-ই সে যোগ করে, অথচ সে

ঈসা মাসীহ এর সাক্ষাত পায় নি এবং তাকে সে দেখেও নি, তবে সে দাবি করে যে, মাসীহ তার নিকট ওহি পাঠায় অতঃপর অধিকাংশ খৃস্টান তাকে সত্য বলে বিশ্বাস করে এবং 'প্রেরিত পল' হিসেবে আখ্যা দেয়। পরবর্তীতে তার পত্রগুলোই তাদের মুকাদ্দাস কিতাব বা পবিত্র কিতাব হিসেবের অংশে পরিগণিত হয়। প্রকৃতপক্ষে 'পল' ইয়াহূদী দার্শনিক প্লটিনাস এর গড়া মতবাদে বিশ্বাসী ছিল, যা নিওপ্লেটোনিজম নামে পরিচিত। প্লটিনাস তার এ মতবাদ দু'টি দর্শন থেকে গ্রহণ করে: একটি হিন্দু দর্শন ও অপরটি গ্রীক দর্শন।

নাসারাদের আকিদার সারাংশ:

১. ভুল ও প্রায়শ্চিত্ত:

বিকৃত খৃস্ট মতবাদ বিশ্বাস করে যে, আদম যখন বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করে ভুলে পতিত হয়, তখন মানব জাতি তার প্রায়শ্চিত্ত করা ও তার থেকে মুক্তিদাতার মুখাপেক্ষী হয়। তখন আল্লাহ তা'আলা বনি আদমের উপর রহম করেন ও তার একমাত্র সন্তানকে প্রেরণ করেন—আল্লাহ তাদের অপবাদ থেকে পবিত্র—, যেন তাকে শূলে চড়িয়ে হত্যা করা হয় পাপের প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে। তাই প্রত্যেক মানুষের বিশ্বাস করা জরুরি মাসিহ আল্লাহর সন্তান, মানব জাতির মুক্তিদাতা ও তাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত-কারী। তাই খৃস্টানরা ক্রুশকে পবিত্র জানে এবং সেটা তাদের প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত হয়।

২. ত্রিত্ববাদ:

খৃস্টানরা সবাই একমত যে, আল্লাহ তিন সত্তা। তিন সত্তাকে তারা তিনটি উকনুম বলে। সে তিন উকনুম হচ্ছে, পিতা, সন্তান ও রুহুল কুদস। অতঃপর তালা বলে: তিনজন মিলে একজন।

কিন্তু উকনুমের অর্থ কি এ নিয়ে তারা দ্বিমত করে, দ্বিমত করে প্রত্যেক উকনুমের স্বভাব ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে। এ কারণে তারা প্রায় দুই হাজার বছর ধরে একগ্রুপ অপর গ্রুপকে কাফের বলে ও একগ্রুপ অপর গ্রুপকে লানত করে।

ইউরোপীয় ইতিহাস সাক্ষী যে, তাদের পরস্পর এসব বিরোধের শিকার মৃত ব্যক্তিদের পরিমাণ সে সংখ্যাকেও ছাড়িয়ে গেছে কয়েকগুণে, তাদের থেকে যে সংখ্যা মুসলিম, ইয়াহূদী ও অগ্নিপূজকদের হাতে মারা গেছে।

আশ্চর্য হচ্ছে এ বিরোধের মূল কারণ ত্রিত্ববাদের হাকিকত না জানা, তাদের কতক আলেম এমনও বলেন, কিয়ামতের দিন যখন তিনি বিকশিত হবেন সেই সময় ব্যতীত তার হাকিকত জানা সম্ভব নয়।

৩. মধ্যস্থতা সাব্যস্তকরণ, হালাল ও হারাম করা:

বিকৃত খৃস্টধর্ম ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহ ও সৃষ্টির মাঝে মধ্যস্থতায় বিশ্বাস করে। উপাস্য ও উপাসকের মাঝে মধ্যস্থতা করাই ধর্মীয় ব্যক্তিদের গুরু দায়িত্ব। তাদের মাধ্যমে একজন ব্যক্তির খ্রিস্টান হওয়া, অপরাধ স্বীকার করা, সালাত ও কুরবানি পেশ করা সম্পন্ন

হয়। এভাবে ধর্মীয় ব্যক্তিরা মূলত তাগুতে পরিণত হয়, তারা মানুষকে গোলাম বানায়। আল্লাহর বিধান তোয়াক্কা না করে তারা অনুসারীদেরকে হালাল-হারাম ফয়সালা দেয়, আল্লাহ বলেন:

﴿ٱتَّخَذُوٓاْ أَحۡبَارَهُمۡ وَرُهۡبَٰنَهُمۡ أَرۡبَابٗا مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلۡمَسِيحَ ٱبۡنَ مَرۡيَمَ وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُوٓاْ إِلَٰهٗا وَٰحِدٗاۖ لَّآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَۚ ٣١﴾ [التوبة: ٣١]

“তারা আল্লাহকে ছেড়ে তাদের পণ্ডিত ও সংসার-বিরাগীদের রব হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং মারয়ামপুত্র মাসীকেও। অথচ এক আল্লাহ ব্যতীত কারো ইবাদত করার নির্দেশ তাদেরকে প্রদান করা হয়নি”।[1]

তারা তাদের পণ্ডিত ও সংসার বিরাগীদের কিভাবে ইবাদত করত, তার ব্যাখ্যায় নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “হারাম ও হালালের ব্যাপারে তাদের আনুগত্য করা”। আদি ইবনে হাতিম থেকে প্রসিদ্ধ হাদিসে এরূপ এসেছে। খৃস্টানরা এখনো যদি কোনো বিষয় হারাম অথবা হালাল করার মধ্যে স্বার্থ দেখে, তারা বাবা ও ধর্মীয় ব্যক্তিদের নিকট তার আবেদন জানায়। অতঃপর বাবারা ইঞ্জিল বিরোধী বিল পাশ করেন।

---

[1] সূরা তাওবা: (৩১)

তাদের এসব নীতি কতগুলো খারাপ পরিণতির জন্ম দিয়েছে, যেমন: পাপমোচন সনদ প্রচলন করা, দীর্ঘ যুগ ধরে ইলম, অধ্যয়ন ও লিখার দায়িত্ব ধর্মীয় ব্যক্তিরা কুক্ষিগত করে রাখা।

৪. তাদের নিকট অবস্থিত তথাকথিত 'কিতাবুল মুকাদ্দাস' এর উপর ঈমান রাখা, যেমন (ওল্ড টেস্টামেন্ট ও নিউ টেস্টামেন্ট)। অর্থাৎ তাওরাত, বিভিন্ন পত্র ও ইঞ্জিলসমূহ। এ ব্যাপারে আমরা অচিরেই আলোচনা করছি:

খৃস্টানদের পবিত্র কিতাবসমূহ:

খৃস্টানদের নিকট 'মুকাদ্দাস কিতাব' দু'প্রকার গ্রন্থকে বুঝায়:

১. আল-'আহদুল কাদিম বা ওল্ড টেস্টামেন্ট: অর্থাৎ তাওরাত ও তার বর্ধিতাংশ বিভিন্ন আসফার, পূর্বে যার আলোচনা হয়েছে।

২. আল-'আহদুলি জাদিদ বা নিউ টেস্টামেন্ট: অর্থাৎ চারটি ইঞ্জিল ও বিভিন্ন পত্র, যার অধিংকাশ লিখেছে 'পল' ও তার ছাত্ররা।

চার ইঞ্জিল:

খৃস্টানদের নিকট শত্তুরের অধিক ইঞ্জিল রয়েছে, তবে তাদের অধিকাংশের নিকট চারটি ইঞ্জিল স্বীকৃত:

১. লুক এর ইঞ্জিল: লুক হচ্ছে 'পল' এর ছাত্র ও সাথী, সে এটাকে গ্রীক ভাষায় লিখেছে।

২. মথি এর ইঞ্জিল : তিনি এটা ইবরানি ভাষায় লিখেন, কিন্তু গ্রীক ভাষা ব্যতীত তার অস্তিত্ব নেই, কে ইবরানি থেকে গ্রীক ভাষায় অনুবাদ করেছে তা অজ্ঞাত।

৩. মার্কস এর ইঞ্জিল: মার্কস এটা গ্রীক ভাষায় লিখেন, কিন্তু তার লেখক আসলে মার্কস নাকি অন্য কেউ এ ব্যাপারে তারা দ্বিমত করেন।

৪. যোহন এর ইঞ্জিল: এর লেখক সম্পর্কেও তারা দ্বিমত করেন, তবে তারা সবাই একমত যে, মাসীহের উলুহিয়াত প্রমাণ করার জন্যই যোহন এ ইঞ্জিলটি লিখেছেন। এটাই সর্বশেষ ইঞ্জিল।

বস্তুত ঈসার অনেক পর এসব ইঞ্জিল লিখা হয়, অনুবাদের মাধ্যমে এক ভাষা থেকে অপর ভাষায় রূপান্তিত হয়, ইংরেজি দ্বিতীয় শতাব্দীর আগে এসব ইঞ্জিল সম্পর্কে কেউ জানত না।

৩২৫ই. সনে বহু ইঞ্জিল থেকে এ চারটি ইঞ্জিল মনোনীত করা হয়, অন্যান্য সকল ইঞ্জিল পুড়িয়ে ফেলা ও ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

খৃস্টানদের দাবি হচ্ছে, এগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহির মাধ্যমে নাযিলকৃত, কিন্তু যে এসব দেখবে কোনো সন্দেহ করবে না যে, এগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে নয়। অনেক ক্ষেত্রে তা বিপরীত ও পরস্পর বিরোধী। প্রত্যেক লেখক তার লেখনীতে স্বীয় আকিদা, অথবা তার নিকট যে ইতিহাস ও জীবন চরিত পৌঁছেছে তাই

লিখেছেন। এগুলো কী নির্ভরযোগ্য সূত্রে পেয়ে লিখেছেন, না তারা নিজেরা রচনা করেছেন তার কিছুই জানা যায় না।

ঈসা মাসীহ এর একটি জীবনী গ্রন্থ পাওয়া যায়, যার নাম (ইঞ্জিলে বারনাবা বা বার্নাবাসের ইঞ্জীল), এ গ্রন্থটি অন্যান্য সকল গ্রন্থ থেকে পৃথক। কুরআন ও সুন্নায় মাসিহ ঈসা সম্পর্কে যে আলোচনা এসেছে, তার সাথে এ কিতাবের রয়েছে সবচেয়ে বেশি মিল। এতে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে স্পষ্টভাবে ঈসা মাসীহ এর র সুসংবাদ রয়েছে। কিন্তু অন্ধ গোঁড়ামি খৃস্টান ধর্মীয় ব্যক্তিদের এ ইঞ্জিল অস্বীকারকারী বানিয়েছে, তারা বিনা দলিলে তার শুদ্ধতা অস্বীকার করে।

অধ্যয়নের জন্য মূল পাঠ

আকানিমুন নাসারা বা 'খৃস্টানদের তিনসত্তা'র উপর লিখিত কিতাব: (ক্যাথলিক ও অর্থোডক্সদের নিকট ঈমানের নীতি)

৩২৫ খৃস্টাব্দে নিসিয়ায় খৃস্টানরা প্রথম বিশ্ব গির্জা সম্মেলন অনুষ্ঠান করে, সেখানে তারা ঈমানের সাধারণ নীতি প্রকাশ করে, ক্যাথলিক বর্ণনায় তার ঘোষণা নিম্নরূপ:

"আমরা এক ইলাহের প্রতি ঈমান আনি। প্রত্যেক বস্তু নিয়ন্ত্রণকারী পিতা, দৃশ্য ও অদৃশ্য প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টিকারী। এক রব যীশুর প্রতি ঈমান আনয়ন করি, মাসীহ ইবনে আল্লাহ, বাবার থেকে জন্ম। পিতার উপাদান থেকে একমাত্র জন্ম বা সৃষ্টি। ইলাহ থেকে ইলাহ, সত্য ইলাহের নূর থেকে নূর, ভূমিষ্ঠ তবে সৃষ্ট নয়, জাওহার বা উপাদানের ক্ষেত্রে বাবার সমতুল্য, যার জন্য আসমান ও জমিনের প্রত্যেক বস্তু সুপ্রতিষ্ঠিত। তিনি আমাদের মুক্তির জন্য অবতরণ ও শরীর ধারণ করেন। আমাদের ভালোবাসেন, আমাদের জন্য কষ্ট স্বীকার ও মৃত্যু বরণ করেন। তিনি তৃতীয় দিনে দাঁড়ান ও আসমানে চলে যান। সেখান থেকে তিনি আগমন করবেন যেন জীবিত ও মৃতরা তার আনুগত্য করে ও রুহুল কুদসকে বিশ্বাস করে। যারা বলে, এমন একটা সময় ছিল যখন তিনি ছিলেন না, তার জন্মের পূর্বে তার অস্তিত্ব ছিল না, তাকে অনস্তিত্ব থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে,

অথবা তিনি বস্তু থেকে অথবা তিনি (আল্লাহ ব্যতীত) অন্য উপাদান থেকে, অথবা তিনি আল্লাহর সন্তান মখলুক, অথবা তিনি পরিবর্তন উপযোগী বা পরিবর্তনশীল, তারা খ্রিস্টান ধর্মের প্রতিনিধিত্বকারী সকল গির্জার পক্ষে থেকে অভিশপ্ত"।[1]

অর্থোডক্সদের বর্ণনায় তার ঘোষণা নিম্নরূপ:

"আমরা এক ইলাহ ও সবকিছু নিয়ন্ত্রণকারী পিতার প্রতি ঈমান আনয়ন করি, যিনি আসমান ও জমিন এবং দৃশ্য ও অদৃশ্য যাবতীয় বস্তুর স্রষ্টা। আমরা এক রব আল্লাহর সন্তান যীশু মাসির উপর ঈমান আনয়ন করি। তিনি সকল যুগের পূর্বে পিতা থেকে জন্ম একমাত্র সন্তান। নূর থেকে নূর, সত্য ইলাহ থেকে সত্য ইলাহ, ভূমিষ্ঠ তবে সৃষ্ট মখলুক নয়, উপাদানের বিবেচনায় পিতার ন্যায়, যার জন্য প্রত্যেক বস্তু সুপ্রতির্ষ্ঠিত, যিনি আমাদের জন্য ও আমাদের মুক্তির জন্য আসমান থেকে অবতরণ করেন, মারইয়াম থেকে রুহুল কুদুসে শরীরত্ব গ্রহণ করেন। তিনি ভালো বাসেন ও আমাদের পক্ষে বিলাতিস নাবতির যুগে শূলে চড়েন, কষ্ট ভোগ করেন, কবরস্থ হন এবং তৃতীয় দিন মৃতদের থেকে দণ্ডায়মান হন, যেমন কিতাবে রয়েছে। তিনি আসমানে চড়ে যান ও তার পিতার ডান পাশে বসেন।

[1] আলকিস ইলয়াস মিকার রচিত: 'ইমানি' কিতাব থেকে সংগৃহীত।

তিনি স্বীয় সম্মানে পুনরায় আসবেন, যেন জীবিত ও মৃতরা আনুগত্য করে, তার রাজত্বের কোনো ক্ষয় ও বিনাশ নেই”।[1]

[1] সংগৃহীত ‘অর্থোডক্স গীর্জার আকিদার উপর ইমানী মূলনীতির সারাংশ’ কিতাব থেকে। রচনা: হাবিব জারজিস।

হিন্দুধর্ম

অনেক আগ থেকে বহু দীনের চর্চা কেন্দ্র হিসেবে ভারতবর্ষ প্রসিদ্ধ। এখানে চর্চা করা সকল ধর্মকেই হিন্দুধর্ম বলা হয়, কখনো নির্দিষ্ট কতিপয় ধর্মের উপর হিন্দু নাম প্রয়োগ করা হয়।

হিন্দুধর্ম কতক আকিদা, চিন্তা ও প্রথার নাম, যুগযুগ ধরে যা চলে আসছে। তার থেকে একাধিক স্বতন্ত্র ধর্ম সৃষ্টি হয়, যা অন্যান্য দেশে বিস্তার লাভ করে।

হিন্দুদের ইলাহ:

হিন্দুদের ইলাহ তিনটি সত্তা বা উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত:

১. ব্রহ্মা: অর্থ সৃষ্টিকারী।

২. বিষ্ণু: সংরক্ষণকারী।

৩. শিব: ধ্বংসকারী।

এতদ সত্ত্বেও তারা বলে: এ তিনটি সত্তা মূলত এক। তারা বিশ্বাস করে ব্রহ্মা হচ্ছে ইলাহ, তার থেকে ব্রহ্মাধর্মও নামকরণ করা হয়।

হিন্দুদের নিকট ইবাদত:

হিন্দুদের ইবাদত দু'প্রকার:

১. ব্রাহ্মনদের ইবাদত, তাদেরকে পণ্ডিত ও সন্ন্যাসী বলা হয়: তারা নিজের নফসকে কষ্ট দিয়ে ও দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ইবাদত

করে, যার চূড়ান্ত লক্ষ্য ব্রহ্মা ইলাহের সাথে একাকার হওয়া, অর্থাৎ তাদের নফস তার অংশে পরিণত হবে।

তারা তাদের সিয়াম রেখে ও পবিত্র কিতাব পাঠ করে জীবন শেষ করে। তারা কখনো জঙ্গলে উলঙ্গ জীবন-যাপন করে, বিভিন্ন প্রকার কঠিন ইবাদত আঞ্জাম দেয়, (যার একটি যোগশাস্ত্র)। তারা বিয়ে করে না এবং দুনিয়ার কোনো অংশের মালিক হয় না।

অলৌকিক ঘটনা ও কারামত প্রমাণ করার জন্য তারা জাদু ও ভ্যাল্কিভাজি শিক্ষা করে, অতঃপর এগুলোকে তারা ব্রহ্মা প্রদত্ত বিশ্বাস করে।

তারা উত্তরাধিকার সূত্রে বিভিন্ন প্রকার ইবাদত শিখে, প্রত্যেক ধর্মীয় শিক্ষক একদল মুরিদকে তার বিশেষ তরিকার উপর দীক্ষা দেয়, মুরিদের পক্ষে মুরব্বির বিরোধিতা কিংবা তার উপর প্রশ্ন করার কোনো অধিকার নেই।

২. সাধারণদের ইবাদত: তারা প্রত্যেক বস্তুর ইবাদত করে, যেমন গাছ, পাথর ও চতুষ্পদ জন্তু। তাদের কেউ অপরিচিত পথিক অথবা তার গাড়িকে সেজদা করে, তাদের কেউ মাকড়সা ও অণুকে সেজদা করে, তাদের পছন্দের প্রত্যেক বস্তুকে তারা সেজদা ও ইবাদত করে। হিন্দুদের পবিত্র কিতাব বলে, সৃষ্টিকর্তা ইলাহ তাদেরকে মূর্তি তৈরি ও তার ইবাদতের নির্দেশ দিয়েছেন। তাদের ধর্মগ্রন্থ আরও

বলে: মূর্তিগুলো তাদেরকে বড় ইশ্বরের ইবাদতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

সম্মিলিত ইবাদত:

তাদের নিকট সম্মিলিত মাবুদ হচ্ছে গাভী, সাধারণ ও বিশেষ ব্যক্তি সবাই গাভীর ইবাদতের ব্যাপারে একমত।

হিন্দুরা গাভীকে প্রচুর সম্মান করে, এমন কি তারা সম্মান করে তার মলকেও। ভারতের সাবেক নেতা গান্ধি, যাকে তৃতীয় বিশ্ব ও জোটনিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলোর নেতা গণ্য করা হয়, তিনি স্পষ্ট বলেছেন: "আমি গাভীর ইবাদত করি এবং বিশ্বের সামনে তার ইবাদতের পক্ষাবলম্বন করি..."।

হিন্দুদের পবিত্র কিতাব:

হিন্দুদের পবিত্র কিতাবকে বেদ বলা হয়। এগুলো কতক কবিতা, আর্তনাদ ও আকুতির নাম, তার কতক ধর্মীয় ব্যক্তিরা পাঠ করে, কতক সবাই পাঠ করে। অনুরূপ তাতে রয়েছে তাবিজ ও জাদু, যা গণকরা করামত প্রকাশ, উপকার হাসিল ও অনিষ্ট দূর করার জন্যে শিক্ষা করে।

হিন্দুদের গুরুত্বপূর্ণ আকিদা:

১. রূহের পুনরায় দেহধারণ বা পুর্নজন্ম: তার অর্থ হচ্ছে বিভিন্ন ধাপে রূহসমূহের এক শরীর থেকে অপর শরীরে স্থানান্তর হওয়া। হিন্দুরা বিশ্বাস করে, মানুষ যখন মারা যায় তার রূহ অপর শরীরে

প্রত্যাবর্তন করে, কখনো জীব-জন্তুর শরীরে—উদাহরণস্বরূপ—। এ ধাপে কেউ ভাগ্যবান হয়, কেউ হয় হতভাগা তার পূর্বের আমলের উপর ভিত্তি করে, কিন্তু দ্বিতীয় ধাপে সে বুঝতে পারে না প্রথম ধাপে তার কি হয়েছিল, এভাবে ধাপে ধাপে স্থানান্তর হতে থাকে, এক সময় পরিচ্ছন্ন ও নিষ্পাপ হয়ে ব্রহ্মার সাথে একাকার হওয়ার উপযুক্ত হয়।

২. ব্রহ্মার সাথে একাকার হওয়া: হিন্দুরা বিশ্বাস করে, সবচেয়ে মহান লক্ষ্য রূহকে শরীরের নাপাক থেকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করা, যেন সে ব্রহ্মার সাথে একাকার ও তার একটি অংশে পরিণত হতে সক্ষম হয়।

এ জন্য সূফী সন্ন্যাসীরা নিজেদের নফসকে শাস্তি ও তার পরিশুদ্ধতার জন্য পরিশ্রম করে, যেন একধাপে সে এ লক্ষ্যে উন্নীত হতে সক্ষম হয়।

৩. ওহি অস্বীকার করা: হিন্দুরা প্রচলিত অহিতে বিশ্বাস করে না, তারা বিশ্বাস করে ইলহাম ও কাশফকে। তারা বিশ্বাস করে, যে নির্জনে একান্ত হয়, নিজেকে অভুক্ত রাখে ও শাস্তি দেয়, তাকে ইলমে বাতিন দ্বারা ধন্য ও তার উপর স্থায়ী হাকিকত উন্মুক্ত করা হয়।

৪. প্রাণীর গোস্ত ভক্ষণ হারাম করা: তাদের একটি গোষ্ঠী প্রাণীর গোস্ত ভক্ষণ করে না। এটা বৈরাগ্য ও নফসকে শাস্তি দেওয়ার

একটা অংশ। তারা ধারণা করে, মানুষের রূহানী ও আধ্যাত্মিক হওয়ার জন্য জরুরি রূহ জাতীয় কিছু না খাওয়া।

অনুরূপ তাদের শরীয়ত বার্ধক্যকালে ব্রাহ্মনের জন্য মানুষের সাথে থাকা হারাম করে, তার উপর ফরয করে নির্জনে ও জঙ্গলে বসবাস করা এবং গাছ থেকে পড়া ফল ব্যতীত কিছু না খাওয়া, আমৃত্যু চুল ও নখ না কাটা।

হিন্দুদের এক বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে: মৃতদের শরীর পোড়ানো।

হিন্দু সমাজের বিভিন্ন স্তর:

হিন্দু শরীয়ত বলে, মানুষ চারটি স্বতন্ত্রভাবে বিভক্ত, প্রত্যেক ভাগের জন্যই রয়েছে বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও অবশ্য করণীয়।

এ ভাগের কারণ:

হিন্দুরা বিশ্বাস করে, ইলাহ (ব্রহ্মা) নিজের নফস থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছেন, তাদের কাউকে সৃষ্টি করেছেন বাহু থেকে, কাউকে সৃষ্টি করেছেন রান থেকে, কাউকে সৃষ্টি করেছেন পা থেকে, এভাবে মানুষের চিরন্তন চারটি ভাগ হয়:

১. ব্রাহ্মণ: ব্রহ্মা তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মুখ থেকে, তারা ধর্মীয় ব্যক্তি ও গণক হবেন, এটাই তাদের নিকট সর্বোচ্চ স্তর।

২. ক্ষত্রিয় : তারা হলেন বাদশাহ, বিচারক ও সেনাবাহিনী, তাদেরকে ব্রহ্মা বাহু থেকে সৃষ্টি করেছেন।

৩. বৈশ্য: তারা হলেন ব্যবসায়ী, কৃষক ও বিভিন্ন কর্মজীবী, তাদেরকে ব্রহ্মা রান থেকে সৃষ্টি করেছেন।

৪. শূদ্র: তারা হল অচ্ছুত স্তরের, তাদেরকে ব্রহ্মা অন্যান্য সকল স্তরের মানুষের সেবার জন্য সৃষ্টি করেছেন। তারা বিশ্বাস করে ব্রহ্মা তাদেরকে পা থেকে সৃষ্টি করেছেন।

অধ্যয়নের জন্য মূল পাঠ

ভারতের নেতা গান্ধি 'আমার মা গাভী' শিরোনামে বলেন:

"নিশ্চয় গাভীর পক্ষাবলম্বন, যা ভারতীয়রা জরুরি করেছে, এটা হল ভারতের পক্ষ থেকে বিশ্বের প্রতি উপহার। এটা মূলত মানুষ ও প্রাণীর মাঝে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের অনুভূতি। ভারতীয় মতবাদ বিশ্বাস করে, গাভী মানুষের মা, বাস্তবেও সে মা।

নিশ্চয় ভারতীয়দের জন্য গাভী ভালো বন্ধু, সেই ভারতের উত্তম সুরক্ষা। আমি যখন গাভী দেখি তখন মনে করি না একটি প্রাণী দেখছি, কারণ আমি গাভীর ইবাদত করি এবং তার ইবাদতের পক্ষ নেই পুরো বিশ্বের সামনে।

আমার মা গাভী আমার প্রকৃত মা অপেক্ষা কয়েক গুণ শ্রেষ্ঠ, প্রকৃত মা এক অথবা দু'বছর আমাদেরকে দুধ দেয়। তার বিনিময়ে সে জীবনভর আমাদের সেবা দাবি করে, কিন্তু গাভী মা আমাদেরকে সর্বদা দুধ দেয়, তার বিনিময়ে সে আমাদের নিকট কিছুই তলব করে না স্বাভাবিক খাবার ব্যতীত। প্রকৃত মা যখন অসুস্থ হয় আমাদের উপর অনেক টাকার বোঝা চাপিয়ে দেয়, কিন্তু গাভী মা যখন অসুস্থ হয় আমরা তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ কিছুই হারাই না।

প্রকৃত মা যখন মারা যায় তার শবদাহে বড় অংকের টাকা খরচ হয়, পক্ষান্তরে আমাদের গাভী মা যখন মারা যায়, তখন আমাদের

উপকার করে, যেমন জীবিত থাকাবস্থায় আমাদের উপকার করত। কারণ আমরা তার শরীরের প্রত্যেক অংশ থেকে উপকৃত হই, এমন কি হাড্ডি ও চামড়া থেকেও...

আমি মায়ের সম্মান কমানোর জন্য এ কথা বলছি না, কিন্তু সে কারণ উল্লেখ করছি, যা আমাকে গাভীর ইবাদতের প্রতি আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছে।

নিশ্চয় লাখো হিন্দু গাভীকে ইবাদত ও সম্মান প্রদর্শন করছে, আমি নিজেকে সেসব হিন্দুদের একজন গণ্য করি"।[1]

---

[1] ভারত উপমহাদেশের বিভিন্ন ধর্ম, ড. আহমদ শিবলি, (পৃ.৬০), সংগৃহীত ইংরেজি দৈনিক (জার্নাল বাহাপান), বুম্বাই , নভেম্বর সংখ্যা: (১৯৬৩ই.)

বৌদ্ধ

বৌদ্ধ ধর্ম আসলে হিন্দু আকিদা বা বিশ্বাসের একটি শাখা। বৌদ্ধ মূলত হিন্দু ধর্মীয় এক উপাধি, তার অর্থ আরিফ বা কুতুব। অতঃপর বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তককে বৌদ্ধ বলা হয়, অবশেষে তা তার নামে পরিণত হয়।

বৌদ্ধ: বৌদ্ধ এক ধনাঢ্য পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন, তবে তিনি স্বীয় জীবন ত্যাগ করে ব্রহ্মা সন্ন্যাসীদের সাথে যোগ দেন, তাদের সাথে জীবন-যাপন করেন, কিন্তু তিনি তাদের নিকট সে হাকিকত পাননি যা তিনি তালাশ করছেন, অর্থাৎ (মানুষ ও পৃথিবীর অস্তিত্বের রহস্য), তাই তিনি তাদের পথ ত্যাগ করে নিজে নিজেই হাকীকত বা সে রহস্যভেদের জন্য পথ চলার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি স্বীয় কাপড় থেকে বিচ্ছিন্ন হন ও জঙ্গলে ঘুরে বেড়ান। নিজের নফসকে শাস্তি দেওয়ার বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করেন, এ অবস্থায় তিনি অনেক বছর পার করেন, কিন্তু কোনো ফল লাভ হয়নি তার।

সর্বশেষ তিনি স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নেন, ফিরার পথে তিনি একটি গাছের নিচে বসেন, সেখানে—তার ভাষ্যানুযায়ী—তার উপর হাকিকত অবতীর্ণ হয়, তখন তিনি নিশ্চিত হন বৌদ্ধ হয়েছেন, অর্থাৎ আরিফ অথবা কুতুব। তার উপর বেহুশ অবস্থা আপতিত হয়, তিনি না খেয়ে ও না পান করে দীর্ঘ দিন ধ্যান করেন,

অতঃপর তিনি মানুষদেরকে সে ভাব ও চিন্তার দিকে আহ্বান করেন, যা তার অন্তরে আপতিত হয়েছে।

বৌদ্ধদের গুরুত্বপূর্ণ আকিদা:

হিন্দু ও বৌদ্ধরা অনেক মূলনীতি ও দার্শনের ক্ষেত্রে একমত, যেমন পুনর্জন্ম ও আল্লাহর সাথে একাকার হওয়ার আকিদা, তবে কয়েকটি বিষয়ে বৌদ্ধরা হিন্দুদের থেকে পৃথক বিশ্বাস পোষণ করে, তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে:

১. ব্রহ্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করা। অর্থাৎ হিন্দুদের উপাস্যের অস্তিত্ব ও তার জন্য কুরবানি পেশ করার বিধান অস্বীকার করা।

২. হিন্দু সমাজের ধাপগুলো অস্বীকার করা।

৩. যুহুদ ও দুনিয়া ত্যাগ করার নতুন পদ্ধতি গ্রহণ করা।

বৌদ্ধদের ক্রমোন্নতি:

বৌদ্ধরা বৌদ্ধকে অসম্ভব ধরণের সম্মান করে, তার জীবন, আমল ও চিন্তা সম্পর্কে অনেক কিছু লিপিবদ্ধ করেছে তারা। বৌদ্ধ ধর্মে অনেক জাতি ও শ্রেণির লোক প্রবেশ করার ফলে তারা দু'ভাগে ভাগ হয়:

১. আদি বৌদ্ধ: তাদেরকে দক্ষিণা বৌদ্ধ বলা হয়, কারণ তারা বার্মা, থাইল্যান্ড ও শ্রীলঙ্কায় বিস্তার লাভ করে। আদি বৌদ্ধরা মূলত বৌদ্ধকে উপাস্য মানে ও তার ইবাদত করে। তাদের গুরু 'লামা' তিব্বতে বাস করেন। তার অনুসারীরা বিশ্বাস করে যে, ইলাহ তার

মধ্যে অনুপ্রবেশ করে। তারা কঠিনভাবে সন্ন্যাসবাদ গ্রহণের পক্ষপাতী।

২. আধুনিক বৌদ্ধ: তাদেরকে উত্তরা বৌদ্ধ বলা হয়, কারণ তারা কুরিয়া, জাপান ও চীনে সম্প্রসারিত।

তারা দর্শনশাস্ত্র, গভীরতা ও একাধিক উপাস্যের কারণে আলাদা বৈশিষ্ট্যের অধিকারী, যেমন চীনে বিশ্বাস করে উপাস্যের সংখ্যা ৩৩টি, জাপানিরা বিশ্বাস করে তাদের রাজা উপাস্যের বংশোদ্ভূত।

শিখ

শিখ মূলত হিন্দু ধর্ম, যা হিজরি নবম তথা (খ্রীস্ট ১৫শতাব্দীতে) আত্মপ্রকাশ করে নানক নামক জনৈক ব্যক্তির হাতে। সে ছিল হিন্দু ক্ষত্রিয় শ্রেণিভুক্ত। তার জীবনের একটা অংশ সে চিন্তা ও ধ্যানে ব্যয় করে। তার সৃষ্টিগত স্বভাব মূর্তি পূজা ও ভাস্কর্যকে প্রত্যাখ্যান করে, যার সংখ্যা হিন্দুদের নিকট অনেক। অনুরূপ সে ত্যাগ করে বিভিন্ন শ্রেণি বিন্যাস। অতঃপর সে হাকিকত অন্বেষণে জমিনে বিচরণ করে, এক সময় ইসলাম শিক্ষার ইচ্ছা করে, কিন্তু পাঞ্জাবের মুসলিমরা তখন ওলিদের ইবাদত ও মাজারকে পবিত্র জানার নামে পূজা দিত, যেমন হিন্দুরা মূর্তি নিয়ে করে। নানক হিন্দু ও মুসলিমদের মাঝে তেমন ব্যবধান দেখলেন না। তখন সে এমন লোকের সাক্ষাতও পায় নি যে তাকে সঠিক ইসলাম শিক্ষা দিবে।

অতঃপর সে ওহদাতুল ওজুদ তথা সর্বেশ্বরবাদে বিশ্বাসী এক সূফীর সাক্ষাত লাভ করে, যার নাম (সায়্যেদ হুসাইন দরবেশ)। তার নিকট সে দীক্ষা লাভ করে যে, প্রত্যেক দীনই সত্য, কারণ মূর্তিগুলো প্রকৃতপক্ষে মহা সত্যের বহিঃপ্রকাশ ও জ্যোতি। যে তার ইবাদত করে বস্তুত সে আল্লাহর ইবাদত করে। (আল্লাহ এসব থেকে পবিত্র)। এ আকিদা উদ্ভ্রান্ত ভবগুরে নানকের খুব পছন্দ হয়, তার উপর সে ঈমান আনে এবং নতুন এক দিনের দিকে দাওয়াত দেওয়া শুরু

করে, যা হিন্দুও নয় আবার ইসলামও নয়। সে হিন্দুদের ইবাদতগৃহ ও ওলিদের কবর গিয়ে গণক ও পণ্ডিতদের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয় এবং তার আকিদার দিকে তাদেরকে আহ্বান করে, বলা হয় সে মক্কায় হজ ও ইরাক সফর করেছে।

নানক ও তার পশ্চাতে তার উত্তরসূরিগণ সূফী ছিল, সেখান থেকে তাদেরকে শিখ বলা হয়, শিখ অর্থ সায়্যেদ অথবা ফারুক (অর্থাৎ পৃথককারী)। শিখরা এগারো হিজরি শতাব্দীতে নানকের জনৈক নাতির আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত সূফীবাদ তরিকা প্রতিপালন করছিল, কিন্তু সে তাদেরকে সুগঠিত যুদ্ধবাজ সংগঠনে রূপ দেয় এবং শিখ নাম পরিবর্তন করেন সিং গ্রহণ করে, যার অর্থ সিংহ, তবে তাদের পুরনো নামই অধিক প্রসিদ্ধ। তখন থেকে শিখরা আক্রমণাত্মক ও যুদ্ধংদেহী জাতিতে পরিণত হয়। তারা তাদের প্রতিবেশী হিন্দু ও মুসলিমদের সাথে বিরতিহীন যুদ্ধে লিপ্ত হয়।

ইংরেজরা যখন ভারত দখল করে শিখরা তাদের আনুগত্য মেনে নেয় ও তাদের খাঁটি বন্ধু হয়। হিন্দু ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ইংরেজরা তাদেরকে খুব ব্যবহার করে।

যখন হিন্দুস্থান দু'টি ভাগে ভাগ হয়: ভারত ও পাকিস্তান, তখন শিখরা ভারতের অধীন ছিল, বিশেষ করে স্বর্ণখচিত ইবাদতগৃহ সমৃদ্ধ তাদের পবিত্র শহরটি। ভারতে তারা অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির বড়

করণ হয়। অনুরূপ মুসলিমদের বিরুদ্ধে কঠোর শত্রুতার কারণে তারা ইয়াহূদীদের মতই তাদের শত্রু বিবেচিত হয়।

শিখদের বিশ্বাস:

নানক যার বিধান দিয়েছে তার সাথে তার উত্তরসূরিগণ অনেক আকিদা ও ইবাদত যোগ করেছে। তন্মধ্যে কিছু হিন্দু ধর্মের সাথে সামঞ্জস্যশীল, কিছু ইসলামের সাথে সামঞ্জস্যশীল। তারা শিখকে আলাদা জাতিতে রূপ দেয়, এমনকি প্রতীক ও পোশাকেও তারা আলাদা। তাদের গুরুত্বপূর্ণ কতিপয় আকিদা:

১. সৃষ্টিকারী এক রবের ইবাদত করা ও মূর্তিপূজা অস্বীকার করা।

২. তারা বিশ্বাস করে, তাদের ইমাম (যাদেরকে তারা গুরু বলে), রব ও সৃষ্টির মাঝে মধ্যস্থতাকারী।

৩. তাদের পবিত্র কিতাব বিশ্বাস করা, যার নাম (গ্রন্থ)।

৪. পুনর্জন্মে বিশ্বাস করা, যেমন হিন্দুদের নিকট প্রসিদ্ধ।

৫. স্বর্ণখচিত ইবাদত গৃহের (অমৃতসর শহরের) হজ করা, তার হাউজে গোসল করা। হাউজ সম্পর্কে তারা সে আকিদা পোষণ করে যেরূপ পোষণ করে হিন্দুরা গঙ্গা সম্পর্কে।

জাতীয়তাবাদ ও দেশাত্মবাদ

'জাতীয়তা' চিন্তামূলক একটি মতবাদ, যার বিশ্বাস একতা ও ভ্রাতৃত্ব হবে স্বজাতিচেতনা অথবা স্বদেশপ্রীতির উপর।

জাতীয়তার ইতিহাস ও উৎপত্তি:

বংশ ও ঐতিহ্য নিয়ে অহংকার করা একাল ও সেকালের জাহিলি যুগের স্বভাব। ইসলাম যেসব জাহিলি রীতি, প্রথা, প্রতীক ও নিদর্শনসমূহ বাতিল করেছে তন্মধ্যে জালিয়াত অন্যতম, তবে অগ্নিপূজক কতক হিংসুক আব্বাসি যুগে আরব জাতীয়তাবাদ হেয় প্রতিপন্ন করে এবং পারস্য জাতীয়তাবাদের ব্যাপারে খুব বাড়াবাড়ি করে। তারা এ আন্দোলনকে 'শু'উবিয়্যাহ' বা জাতীয়তাবাদ নাম দেয়।

বস্তুবতা হচ্ছে, এ আন্দোলনের তখন স্বতন্ত্র চিন্তামূলক দর্শন ছিল না, বরং এটা ছিল ইসলামের উপর হিংসাত্মক ষড়যন্ত্র।

জাতীয়তার নতুন অর্থের জন্ম হয় ইউরোপে গত শতাব্দীতে, যখন খৃস্টানদের ধর্মীয় বন্ধন দুর্বল ও বৃহৎ ইউরোপ খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যায়, যা অনেক জাতি ও দেশকে অন্তর্ভুক্ত করে রেখেছিল। এ ছাড়া আরো কতক কারণে জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়, যার উল্লেখ সামনে আসছে:

জাতীয়তা চিন্তাধারা সৃষ্টির কারণ:

১. ফ্রান্স বিপ্লব, আধুনিক ইতিহাসে তাতে সর্বপ্রথম ধর্মহীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও ধর্মীয় ভ্রাতৃত্ব ত্যাগ করে শুধু আঞ্চলিকতার উপর বন্ধুত্ব কায়েম করার নীতি অস্তিত্বে আসে। এর মাধ্যমেই ধর্মীয় ভিত্তি বাদ দিয়ে শুধু জন্মভূমি বা নিজ দেশের প্রতি আনুগত্যের নীতি প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

২. পুরনো সংস্কৃতির উত্থান, বিলুপ্ত ইতিহাস চর্চা করা ও তার নিদর্শনসমূহ জিন্দা করা, ইত্যাদি কারণে প্রত্যেক জাতি অথবা দেশ তার অতীত নিয়ে অহংকার করতে থাকে ও তার গৌরবগাথা নির্মাণ করে।

৩. ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলো তার মহাদেশের ভেতর সংগ্রামে লিপ্ত হয় ও অন্যান্য উপমহাদেশ দখলে মরিয়া হয়ে উঠে।

এ তিনটি কারণ জাতীয়তাবাদ মতবাদ সৃষ্টির ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা রেখেছে। দ্বিতীয়ত দু'টি বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে জাতীয়তাবাদী মতবাদ তার শীর্ষ চূড়ায় পৌঁছে, তখন জাতীয়তাবাদী আদর্শের ধারক অনেক বড় ব্যক্তিদের আবির্ভাব ঘটে, যেমন ইউরোপে হিটলার ও মুসোলিনি এবং প্রাচ্যে গান্ধি ও কামাল আতাতুর্ক।

কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপে জাতীয়তাবাদ চিন্তাধারা নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে, তখন ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলো দেখল বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠীর বন্ধন ও ঐক্য খুব জরুরি। তার ভিত্তিতে তারা সামরিক জোট ও অর্থনৈতিক সংস্থা গড়ে তুলে, যেমন ইউরোপ ইউনিয়নের

ন্যাটো গ্রুপ ও সম্মিলিত ইউরোপীয় অর্থনৈতিক বাজার। তবে আরব রাষ্ট্রসমূহে জাতীয়তাবাদ সৃষ্টির ইতিহাস ভিন্ন:

ইসলামি বিশ্বে জাতীয়তাবাদ ও দেশাত্মবাদ:

দেশাত্মবাদ: দেশাত্মবাদ তার বর্তমান সংজ্ঞাসহ সর্বপ্রথম মিসরে প্রকাশ পায় ফ্রান্সের আক্রমণ পরবর্তী সময়ে। তার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মিসরকে ইসলামি বিশ্ব ও উসমানী খিলাফত থেকে বিচ্ছিন্ন করা, কারণ ইসলামি বিশ্বের ইলম, ঐতিহ্য ও মর্যাদার ধারক ছিল মিসর।

প্রাচ্যবিদ ও তাদের ন্যায় অন্যান্যরা ইসলামি ঐতিহ্য নিশ্চিহ্ন ও ফিরআউনি স্বভাব জাগ্রত করে মিসরে ফিরআউনি চরিত্র পুনরায় জীবিত করার লক্ষ্যে অনেক শ্রম ব্যয় করে। এরূপ ষড়যন্ত্র তারা ইসলামি সকল দেশের ক্ষেত্রে করে।

মিসরে দেশাত্মবাদ স্পষ্টভাবে সফলতা অর্জন করে, রাজনৈতিক ব্যক্তিরা তার উপর দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস স্থাপন করে, যেমন সা'দ জগলুল, তার শ্লোগান ছিল, (দীন আল্লাহর জন্য কিন্তু দেশ সবার জন্য), এবং মুস্তফা কামিল, তার শ্লোগান ছিল, (যদি আমি মিসরি না হতাম, মিসরি হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করতাম)।

চিন্তাবিদ, সাংবাদিক ও কবিদের মাঝে এ মতবাদ ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে, এমন কি আহমদ শাওকি, যিনি ইসলামি খিলাফত ও

ইসলামি বন্ধনের পক্ষাবলম্বন করতেন, তিনিও দেশাত্মবাদী ছিলেন, তার একটি কবিতা:

أنا مصر بناني من بنى   هرم الدهر الذي أعيا الفنا

আমি মিসরি, আমার আঙ্গুলগুলো বানিয়েছে সেই পিরামিডগুলো , যা ধ্বংসকে পরাজিত করেছে।

এ মতবাদের পশ্চাতে লোকানো ষড়যন্ত্র তখন উন্মোচিত হয়, যখন তার ধারক যেমন ত্বাহা হুসাইনরা ঘোষণা করে, (মিসর পাশ্চাত্যের একটি অংশ, প্রাচ্যের সাথে তার নিকটবর্তী ও দূরবর্তী কোনো সম্পর্ক নেই। ইসলামের মিসর জয় করার অর্থ একটি আরবি সামরিক যুদ্ধ।

তাদের কেউ আরবি হরফ ত্যাগ করে ল্যাটিন ভাষা প্রতিস্থাপন ও বিশুদ্ধ ভাষার পরিবর্তে মিসরি আঞ্চলিক ভাষা প্রয়োগের দাবি করল। তবে মিসরি দেশাত্মবাদ কয়েকটি কারণে দুর্বল হয়ে পড়ে, তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে: সামরিক অভ্যুত্থানের পর মিসর আরবি জাতীয়তাবাদের রূপ নেয়—যা দেশাত্মবাদ থেকে ব্যাপক— ও বিশ্ব সমাজতন্ত্রের দাবি উঠে, যা স্বভাবতই দেশাত্মবাদের সাথে সাংঘর্ষিক। কিন্তু ইসলামি বিশ্বে ভূ-খণ্ডীয় দেশাত্মবাদ ধীরে ধীরে প্রাণ পেতে থাকে, যা উম্মতে মুসলিমার ঐক্যের পথে এক বড় বাধা।

জাতীয়তাবাদ: বিশ্ব ক্রুসেড ও খ্রীস্ট সম্রাজ্য মিলে ইসলামি বিশ্বে জাতীয়তাবাদ সৃষ্টি করে কয়েকটি উদ্দেশ্যে, আর তা হচ্ছে আরব

রাজ্যে ইয়াহূদী রাষ্ট্র ও খৃস্টান শাসন কায়েম করা অথবা আরবে পশ্চিমাদের তাবেদার রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ভূমিকা স্বরূপ উসমানী খিলাফত ধ্বংস ও ঈমানি বন্ধন ছিন্ন করা।

ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত যে, সর্বপ্রথম জাতীয়তাবাদের আহ্বান করে ইয়াহূদীরা তুরস্কে ও খৃস্টানরা আরব বিশ্বে, অতঃপর তাদের সাথে হাত মিলায় বিদ্বেষপোষণকারী স্বভাষী ও স্বজাতি কতক শ্রেণি, যেমন নুসাইরিয়া, অর্থোডক্স, শিয়া-রাফেদি ও কতক নব্য ফ্রাঙ্গিস, অথবা তাদের দ্বারা প্রতারিত কতক আহলে সুন্নাহ।

কতক গোপন সংগঠন দ্বারা জাতীয়তাবাদ প্রচার করা হয়, প্রকৃতপক্ষে যা ছিল ইয়াহূদীদের গুপ্ত সংঘ 'মাসুনিয়াহ' বা ফ্রিম্যাসনের শাখা। একই সময় এসব সংগঠন তুরস্কে তুরকি জাতীয়তাবাদ ও আরব রাষ্ট্রসমূহে আরবি জাতীয়তাবাদের আহ্বান করে, অথচ তাদের অনেকে তুরকি বা আরবি ছিল না।

তুরকি জাতীয়তাবাদীরা অ-তুর্কি কামাল আতাতুর্কের নেতৃত্বে উসমানিয়া খিলাফত বিলুপ্ত করে, শরীয়তের বিধান বাতিল করে। আরো বিলুপ্ত করে আরবি হরফ, আযান পর্যন্ত তারা বাতিল করে তুরকি ভাষায় তার প্রচলন করে। তারা ইসলামের নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের পরিবর্তে মূর্তিপূজক নেতাদের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে, যেমন চেঙ্গিস খান ও তার নাতি হালাকু, যে বাগদাদ ধ্বংস করেছিল।

অধিকন্তু আরবি জাতীয়তাবাদ প্রচারকারীরা সাম্প্রদায়িকতা উস্কে দিয়ে আরব জাতীয়তাবাদের গণজাগরণ সৃষ্টি করে। প্রকাশিত ঐতিহাসিক সনদ প্রমাণ করে যে, জাতীয়তাবাদের সাথে সম্পৃক্ত প্রত্যেক নেতা ও চিন্তাবিদ উপনিবেশ রাষ্ট্রসমূহের সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত ছিল, বিশেষ করে ইংল্যান্ডের সাথে। এ ইংল্যান্ডই আরব লীগ, (তথা আরব রাষ্ট্রসমূহের সংস্থা) গঠনের রূপ রেখা তৈরি করে। তখন জাতীয়তাবাদের কোনো আকিদা কিংবা নির্ধারিত চিন্তা না থাকার ফলে তারা সমাজতন্ত্র বিপ্লবের সাথে যোগ দেয়, যারা ফিলিস্তিনে ইয়াহূদী রাষ্ট্র কায়েমের পর থেকে সামরিক বিপ্লব ও বামপন্থী দলগুলোর সহায়তায় মুসলিমদের উপর নির্যাতন পরিচালনা করে আসছিল।

আরব বিশ্বে সবচেয়ে বড় জাতীয়তাবাদী দল হচ্ছে 'বিপ্লবী আরব সমাজতান্ত্রিক' দল, যার প্রতিষ্ঠাতা খৃস্টান মিশাল আফলাক।

১৩৮৭হি. সফর মোতাবেক জুন ১৯৬৭ই. পরাজয়ের মাধ্যমে আরব জাতীয়তাবাদের মিথ্যাচার স্পষ্ট ও পতন্মোখ হয়, বলা যায় এখন তা মৃত্যুমুখে পতিত।

আরব জাতীয়তাবাদের নেতৃত্ব দিয়ে মিসর এখন তার চিন্তা থেকে দেশাত্মবাদের দিকে প্রত্যাবর্তন করেছে। অনুরূপ ব্যর্থ হয় ঐক্যের পরিকল্পনা যা কতক আরব দেশের মাঝে সম্পাদিত হয়েছিল, আরব লীগের কার্যক্রম দুর্বল হয়ে এখন প্রায় নিঃশেষের মত। বর্তমান

আরব দেশগুলো একতা ও অঙ্গীভূত হওয়ার চিন্তা থেকে সরে পারস্পরিক সহায়তা অথবা আঞ্চলিক পূর্ণতার দিকে ধাবিত হচ্ছে।

ইসলামের উপর আরব জাতীয়তাবাদের ক্ষতিকর প্রভাব:

শায়খ আব্দুল আযিয বিন বায রাহিমাহুল্লাহ বলেন: “জেনে রেখো এ দাওয়াত—অর্থাৎ আরব জাতীয়তাবাদের দাওয়াত—পাশ্চ্যতের খৃস্টানরা সৃষ্টি করেছে চটুল কথা, নানা স্বপ্ন ও প্রতারণামূলক বিভিন্ন পদ্ধতিতে ইসলামের ঘরে তার বিরুদ্ধাচারণ ও তাকে নিঃশেষ করার উদ্দেশ্যে, ফলে ইসলামের শত্রু কতিপয় আরব তা সাদরে গ্রহণ করে। অনেক তথাকথিত উদারপন্থী ও তাদের অনুসারী মূর্খরা ধোঁকায় পতিত হয়। নাস্তিক ও ইসলামের দুশমনরা এটা দেখে বিভিন্ন জায়গায় আনন্দ প্রকাশ করে।

ইসলামে অকাট্যভাবে প্রমাণিত যে, আরব জাতীয়তাবাদ অথবা অপর কোনো জাতীয়তাবাদের দিকে আহ্বান করা ভ্রান্ত ও বাতুলতা, মহা অপরাধ, ঘৃণার বস্তু, নিন্দিত জাহেলিয়াত। অধিকন্তু জাতীয়তাবাদ ইসলাম ও তার অনুসারীদের বিপক্ষে প্রকাশ্য ষড়যন্ত্র, কায়েকটি কারণে:

প্রথম কারণ: আরব জাতীয়তাবাদ অনারব মুসলিম ও আরব ভাইয়ের মাঝে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি ও দূরত্ব তৈরি করে, বরং আরবদেরও বিচ্ছিন্ন করে, কারণ সব আরব তা পছন্দ করে না।

দ্বিতীয় কারণ: ইসলাম জাহিলি দাওয়াত ও তার থেকে সতর্ক করেছে। কোনো অস্পষ্টতা রাখেনি, বিভিন্ন জায়গায় বারবার বলেছে, বরং কতক দলিল জাহিলি সকল আচরণ ও আমল থেকে নিষেধ করেছে, ইসলামে স্বীকৃত কতক ভালো আচরণ ব্যতীত। এতে সন্দেহ নেই যে, আরব জাতীয়তাবাদের দাওয়াত জাহিলি দাওয়াত, কারণ এটা অনৈসলাম ও অসত্যের আহ্বান।

তৃতীয় কারণ: আরব জাতীয়বাদ প্রচার করার অর্থ আরব কাফের ও আরব অমুসলিম নাস্তিকদের সাথে বন্ধু ও অন্তরঙ্গ করার প্রথম সিঁড়ি। মুসলিম ও অমুসলিম যারা জাতীয়তাবাদ সমর্থন করে না তাদের মোকাবিলায় কাফেরদের সাহায্য গ্রহণ করা। এতে যে ফাসাদ ও কুরআন-সুন্নার স্পষ্ট বিরোধিতা রয়েছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না, কারণ কুরআন ও সুন্নাহর দাবি আরব-অনারব সকল কাফিরকে অপছন্দ কর, তাদের সাথে শত্রুতা কর এবং তাদেরকে বন্ধু ও অন্তরঙ্গ হিসেবে গ্রহণ করো না। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلۡيَهُودَ وَٱلنَّصَٰرَىٰٓ أَوۡلِيَآءَۘ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِيَآءُ بَعۡضٖۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمۡ فَإِنَّهُۥ مِنۡهُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ٥١ فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٞ يُسَٰرِعُونَ فِيهِمۡ يَقُولُونَ نَخۡشَىٰٓ أَن تُصِيبَنَا دَآئِرَةٞۚ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأۡتِيَ بِٱلۡفَتۡحِ أَوۡ أَمۡرٖ مِّنۡ عِندِهِۦ فَيُصۡبِحُواْ عَلَىٰ مَآ أَسَرُّواْ فِيٓ أَنفُسِهِمۡ نَٰدِمِينَ ٥٢﴾ [المائدة: ٥١، ٥٢]

“হে মুমিনগণ, ইয়াহূদী ও নাসারাদেরকে তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। আর তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে নিশ্চয় তাদেরই একজন। নিশ্চয় আল্লাহ যালিম কওমকে হিদায়েত দেন না। সুতরাং তুমি দেখতে পাবে, যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে, তারা কাফিরদের মধ্যে (বন্ধুত্বের জন্য) ছুটছে। তারা বলে, ‘আমরা আশঙ্কা করছি যে, কোন বিপদ আমাদেরকে আক্রান্ত করবে’। অতঃপর হতে পারে আল্লাহ দান করবেন বিজয় কিংবা তার পক্ষ থেকে এমন কিছু, যার ফলে তারা তাদের অন্তরে যা লুকিয়ে রেখেছে, তাতে লজ্জিত হবে”।[1]

সুবহানাল্লাহ! আল্লাহর বাণী কী সত্য, কী স্পষ্ট! জাতীয়তাবাদীরা আরব জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে জোট গঠন ও ঐক্যবদ্ধ হওয়ার দাওয়াত দেয়, মুসলিম ও কাফির কোনো পার্থক্য করে না,

﴿ يَقُولُونَ نَخۡشَىٰٓ أَن تُصِيبَنَا دَآئِرَةٞۚ ﴾ [المائدة: ٥١، ٥٢]

“তারা বলে, আমরা আশঙ্কা করছি আমাদের উপর বিপদ ফিরে আসার” [সূরা আল-মায়েদাহ: ৫২] আমরা আশঙ্কা করছি ঔপনিবেশিক আমাদের দেশে পুনরায় ফিরে আসবে, আমরা আশঙ্কা করছি আমাদের শত্রুদের হাতে আমাদের সম্পদ লুণ্ঠিত হবে। আমাদের দেশে ফিরে আসা ও আমাদের সম্পদ লুণ্ঠন করার

---

[1] সূরা মায়েদাহ: (৫১-৫২)

উদ্দেশ্যে তারা আরব জাতীয়তাবাদকে সমর্থন করে এবং বলে: জাতীয়তাবাদ নীতি আরব আরবের মাঝে পার্থক্য করে না, যদিও তাদের দীন ভিন্ন। এটা আল্লাহর কিতাবের বিরোধিতা ব্যতীত আর কী হতে পারে? আল্লাহর শরীয়তের বিরোধিতা ব্যতীত আর কি? আল্লাহর সীমালঙ্ঘন ব্যতীত আর কি? এবং আল্লাহর দীন ত্যাগ করে বন্ধুত্ব, শত্রুতা, মহব্বত ও বিদ্বেষ পোষণ ব্যতীত আর কি?

চতুর্থ কারণ: জাতীয়তাবাদের দাওয়াত ও তাকে ঘিরে জোট গঠন করা সমাজকে অবশ্যম্ভাবী করে আল্লাহর বিধান ত্যাগ করতে, কারণ অমুসলিম জাতীয়তাবাদীরা কুরআনকে ফয়সালাকারী মানবে না, তখন এটা জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দকে সুযোগ করে দিবে মানব রচিত কানুন গ্রহণ করতে, যেন তার দৃষ্টিতে জাতীয়তাবাদী সমাজ বরাবর হয়, এটা কুরআনুল কারিমের বিধানের বিপরীত। এ কথা তারা অনেকে স্পষ্ট বলেছে। এখানে বড় ফাসাদ ও স্পষ্ট কুফর এবং প্রকাশ্যভাবে দীন ত্যাগ ও বদ্বীনি গ্রহণ করা, যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤۡمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيۡنَهُمۡ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِيٓ أَنفُسِهِمۡ حَرَجٗا مِّمَّا قَضَيۡتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسۡلِيمٗا ٦٥ ﴾ [النساء: ٦٥]

“অতএব তোমার রবের কসম, তারা মুমিন হবে না যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে বিচারক নির্ধারণ করে, তারপর তুমি যে ফয়সালা দেবে সে ব্যাপারে নিজেদের অন্তরে কোন

দ্বিধা অনুভব না করে এবং পূর্ণ সম্মতিতে মেনে নেয়”।[1] অন্যত্র তিনি বলেন:

﴿ أَفَحُكۡمَ ٱلۡجَٰهِلِيَّةِ يَبۡغُونَۚ وَمَنۡ أَحۡسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكۡمٗا لِّقَوۡمٖ يُوقِنُونَ ٥٠ ﴾ [المائدة: ٥٠]

“তারা কি তবে জাহিয়্যাতের বিধান চায়? আর নিশ্চিত বিশ্বাসী কওমের জন্য বিধান প্রদানে আল্লাহর চেয়ে কে অধিক উত্তম”?[2] অন্যত্র তিনি বলেন:

﴿ وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡكَٰفِرُونَ ٤٤ ﴾ [المائدة: ٤٤]

“আর যারা আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তার মাধ্যমে ফয়সালা করে না, তারাই কাফির”।[3] অন্যত্র তিনি বলেন:

﴿وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ٤٥ ﴾ [المائدة: ٤٥]

“আর আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তার মাধ্যমে যারা ফয়সালা করবে না, তারাই যালিম”।[4] অন্যত্র তিনি বলেন:

﴿ وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ ٤٧ ﴾ [المائدة: ٤٧]

“আর আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তার মাধ্যমে যারা ফয়সালা করে না, তারাই ফাসিক”।[1]

---

[1] সূরা নিসা: (৬৫)

[2] সূরা মায়েদা: (৫০)

[3] সূরা মায়েদাহ: (৪৪)

[4] সূরা মায়েদাহ: (৪৫)

অতএব যেসব রাষ্ট্র আল্লাহর শরীয়ত মোতাবেক ফয়সালা করে না, তার বিধানের নিকট অনুগত নয়, সেটা জাহিলি, কাফের, জালিম ও ফাসেক রাষ্ট্র কুরআনুল কারিমের স্পষ্ট দলিলের ভিত্তিতে। আহলে-ইসলাম ও মুসলিমদের দায়িত্ব এসব শাসকদের সাথে আল্লাহর জন্য বিদ্বেষ পোষণ ও শত্রুতা করা, যতক্ষণ না এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে এবং তার শরীয়ত মোতাবেক ফয়সালা করে, যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿ قَدۡ كَانَتۡ لَكُمۡ أُسۡوَةٌ حَسَنَةٌ فِيٓ إِبۡرَٰهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ إِذۡ قَالُواْ لِقَوۡمِهِمۡ إِنَّا بُرَءَٰٓؤُاْ مِنكُمۡ وَمِمَّا تَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرۡنَا بِكُمۡ وَبَدَا بَيۡنَنَا وَبَيۡنَكُمُ ٱلۡعَدَٰوَةُ وَٱلۡبَغۡضَآءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤۡمِنُواْ بِٱللَّهِ وَحۡدَهُۥٓ ٤ ﴾ [الممتحنة : ٤]

"ইবরাহীম ও তার সাথে যারা ছিল তাদের মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ। তারা যখন স্বীয় সম্প্রদায়কে বলছিল, 'তোমাদের সাথে এবং আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যা কিছুর উপাসনা কর তা হতে আমরা সম্পর্কমুক্ত। আমরা তোমাদেরকে অস্বীকার করি, এবং উদ্রেক হল আমাদের ও তোমাদের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ চিরকালের জন্য, যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আন"[2]।[3]

---

[1] সূরা মায়েদাহ: (৪৭)

[2] সূরা মুমতাহিনা: (৪)

[3] ইসলাম ও বাস্তবতার নিরিখে আরব জাতীয়তাবাদের সমালোচনা, শায়খ ইবনে

বায রহ. রচিত।

অধ্যয়নের জন্য মূল পাঠ

আরব জাতীয়তাবাদ শুরুর ইতিহাস:

লেবাননে ছোট্ট এক সংস্থা ছিল যুবকদের, ‘সুশীল সমাজ’ নামে—তাদের অধিকাংশ ছিল খৃস্টান, যারা সিরিয়ার ইংরেজি কলেজে পড়ুয়া—প্রথম তারা লেবাননকে তুরস্ক থেকে স্বাধীন করার দাবি জানায়।

খ্রিস্টানরা তাদের জন্য আনুমানিক (১৮৭৬ই.) সালে “বিপ্লবী গোপন সংঘ” নামে একটি সংগঠন তৈরি করে। তারা বৈরুতের সীমান্তে অবস্থিত পাথুরে সমুদ্র তীর ‘রাওশাহ’ নামক স্থানে সন্ধ্যায় জড়ো হত, তাদের উদ্দেশ্য হাসিলে সর্বোত্তম করণীয় সম্পর্কে আলোচনা ও পরামর্শের জন্যে। যুবকরা সবচেয়ে বেশি চিন্তিত ছিল তুর্কিদের তাদেরকে হেয় ও নিম্নস্তরের জ্ঞান করার বিষয় নিয়ে, এটাকে তারা অপমান বোধ করত, তবে আরব মুসলিমরা যখন উসমানী খিলাফতের সমালোচনা করত, তখন তারা বলার সাহস করত: (এটা তুর্কি শাসন), কারণ সেটা ছিল ইসলামি খিলাফত, যা তাদের গা জ্বালার বিষয় হয়।

তুর্কি শাসনের কারণে মুসলিমরা কখনো নিজেদের বিদেশী ভাবত না, আর না ভাবত নিজেদের অসহায় কিংবা পরদেশী। কিন্তু খৃস্টানরা সর্বদা চিন্তা করত সে তুর্কি সুলতানের একজন প্রজা, তুর্কি শাসন কখনো তার শাসন হতে পারে না।

বেশি সময় পার হয় নি, অতিশীঘ্র তারা বুঝতে সক্ষম হয় যে, যদি তারা তাদের লক্ষ্যে পৌঁছতে চায়, অবশ্যই তাদেরকে মুসলিমদের সাথে একযোগে কাজ করতে হবে, যেন মুসলিমরা তাদের স্বীকৃতি ও সনদস্বরূপ হয়।

তাদের জন্য জরুরি ছিল তুর্কিদের মোকাবিলায় মুসলিম-খ্রীস্টান এক প্লাটফর্মে দাঁড়ানো, কিন্তু তখন আরব মুসলিম ও আরব খৃস্টানদের মাঝে আরব জাতীয়তাবাদ ব্যতীত কোনো বন্ধন ছিল না। আরবদের মাঝে আরব জাতীয়তাকে ব্যবহার করা ব্যতীত তুর্কিদের বিপক্ষে বিদ্রোহের বীজ বপন করা সম্ভব নয়। অনুরূপ আরব মুসলিম ও তুর্কিদের থেকে প্রতিশোধ স্পৃহা লালনকারী আরব খৃস্টানদের সাথে তাদের এক হওয়াও সম্ভব নয় জাতীয়তাবাদ ব্যতীত।

এ নীতিতে "বিপ্লবী গোপন সংঘে"র সদস্যবৃন্দ আশ্বস্ত হয় যে, তুর্কিদের থেকে মুক্তি এবং তাদের মাঝে ও মুসলিমদের মাঝে সমতার একমাত্র পথ জাতীয়তাবাদ। জাতীয়তার ভিত্তিতে আরব সমাজকে গড়ে তোলা, যা ভবিষ্যতে তুর্কিদের মোকাবিলা করতে সক্ষম হবে।

খ্রীস্টান নেতৃবৃন্দ আরেকটি পরিকল্পনা গ্রহণ করে, আর তা হচ্ছে বৈরুতে ফ্রিম্যাসন সমাবেশে মুসলিম নেতৃবৃন্দের অন্তর্ভুক্ত করা। তাদের সাথে অংশগ্রহণ করে বিপ্লবী গোপন সংঘের সদস্যরাও[1]।

[1] যায়ন নুরুদ্দিন যায়ন রচিত "আরব জাতীয়তাবাদের উৎপত্তি" কিতাব থেকে সংগৃহীত, (পৃ.৬০-৬১), খৃস্টান ফারিস নামর থেকে উদ্ধৃত, যে গোপন জাতীয়তাবাদ সমিতির একজন প্রতিষ্ঠাতা।

নাস্তিকতা

নাস্তিকতা—অর্থ স্রষ্টাকে অস্বীকার করা—মূলত অন্তরে অসুস্থতা, চোখের অন্ধত্ব, বিবেকের পতন ও স্বভাবের দৈন্যতা থেকে মানুষ নাস্তিক হয়। সুস্থ মানুষ কখনো এ রোগে আক্রান্ত হয় না, সুস্থ জাতি তো পরের কথা।

কোনো যুগেই নাস্তিকতা ব্যাপক আকার ধারণ করে নি, পূর্বের কোনো জাতি নাস্তিকতায় বিশ্বাসে বিশ্বাসী ছিল না, নাস্তিকরা সর্বদা দলছুট কতক লোক।

পূর্ববর্তী উম্মতের কুফরি দু'টি বিষয়ে সীমাবদ্ধ ছিল:

১. আল্লাহর সাথে শির্ক ও তার সাথে অপরের ইবাদত করা, যেমন পাথর, গণক, বাদশাহ ইত্যাদি।

২. আল্লাহ সম্পর্কে এবং আল্লাহর সাথে কোন সিফাৎ প্রযোজ্য ও কোন সিফাত প্রযোজ্য নয় সেটা সম্পর্কে অজ্ঞতা, যেমন কেউ বিশ্বাস করে তার সন্তান অথবা স্ত্রী রয়েছে, অথবা তিনি সব দেখেন না ও সব শ্রবণ করেন না, অথবা তিনি সৃষ্টি জীবের ন্যায়, অথবা তিনি কোনো বস্তুতে অনুপ্রবেশ করেন।

এতদসত্ত্বেও তারা সৃষ্টিকর্তা, রিযিকদাতা ও পরিকল্পনাকারী রবের উপর আকিদায় বিশ্বাসী ছিল। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ قُلۡ مَن يَرۡزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلۡأَرۡضِ أَمَّن يَمۡلِكُ ٱلسَّمۡعَ وَٱلۡأَبۡصَٰرَ وَمَن يُخۡرِجُ ٱلۡحَيَّ مِنَ ٱلۡمَيِّتِ وَيُخۡرِجُ ٱلۡمَيِّتَ مِنَ ٱلۡحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلۡأَمۡرَۚ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُۚ فَقُلۡ أَفَلَا تَتَّقُونَ ٣١ ﴾ [يونس: ٣١]

"বল, 'আসমান ও জমিন থেকে কে তোমাদের রিযক দেন? অথবা কে (তোমাদের) শ্রবণ ও দৃষ্টিসমূহের মালিক? আর কে মৃত থেকে জীবিতকে বের করেন আর জীবিত থেকে মৃতকে বের করেন? কে সব বিষয় পরিচালনা করেন'? তখন তারা অবশ্যই বলবে, 'আল্লাহ'। সুতরাং, তুমি বল, 'তারপরও কি তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করবে না?"।[1]

এ বিশ্ব জগতের কোনো ইলাহ নেই এ মতবাদ এত বড় পথভ্রষ্টতা, যা মানব জাতির কোনো সম্প্রদায় কখনো ঘোষণা করে নি, বর্তমান যুগের ইউরোপ সমাজ ব্যতীত, তবুও তার সকল সদস্য নয়।

নাস্তিকতা সৃষ্টির কারণ:

পাশ্চাত্য বিশ্বে নাস্তিকতা সৃষ্টি স্থানীয় কিছু কারণ রয়েছে। সেখান থেকে অন্যান্য দেশে নাস্তিকতা আমদানি হয় স্নায়ু যুদ্ধ ও অন্ধ অনুকরণ দ্বারা, যাকে তারা বিজ্ঞান ও সভ্যতা বলে।

এ কারণগুলো একটির সাথে অপরটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত, তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে:

[1] সূরা ইউনুস: (৩১)

১. ইউরোপ সঠিক ঈমান ও সত্য দীনে বিশ্বাসী ছিল না, বরং তারা পর্যায়ক্রমে এক জাহেলিয়াত থেকে অপর জাহেলিয়াতে পদার্পণ করেছে, যেমন:

ক. আদি যুগে গ্রীক ও রোমানদের (বর্তমান ইউরোপের লোকদের) নিকট মূর্তিপূজা ও একাধিক ইলাহের ইবাদত প্রচলিত ছিল।

খ. তাদের ইতিহাসের মধ্যযুগে তারা (ইউরোপ) সেখান থেকে বিকৃত খৃস্টান ধর্মে দীক্ষিত হয়।

গ. বিকৃত খৃস্টান ধর্ম থেকে তারা (ইউরোপ) ধ্বংস, নাস্তিকতা ও বর্তমান যুগের জাহেলিয়াতে প্রত্যাবর্তন করে।

তাই বলা যায় ইউরোপ যে দীন বা ধর্ম থেকে নাস্তিকতা গ্রহণ করেছে সেটা আল্লাহর দীন ছিল না, বরং সেটা ছিল খৃস্টানদের বিকৃত দীন, যা সাধু 'পল' ও তার অনুসারীরা প্রবর্তন করেছে। তা ছিল কুসংস্কারে ভরপুর, যা সুস্থ বিবেক ও বিশুদ্ধ প্রকৃতি সম্পন্ন কোনো ব্যক্তি গ্রহণ করতে পারে না, যেমন একটি কুসংস্কার ছিল আল্লাহর সাথে সংশ্লিষ্ট ত্রিত্ববাদ, ঈসা মাসীহের উলুহিয়াতে বিশ্বাস এবং আল্লাহ থেকে তার জন্ম গ্রহণ করা ও তার ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার উপর বিশ্বাস। অনুরূপ তাদের মধ্যে ছিল প্রায়শ্চিত্ত, পরিত্রাণ মতবাদ ও গোপন পবিত্র রহস্য। এ ছাড়া তাদের ইঞ্জিলসমূহ বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক বৈপরীত্য এবং স্পষ্ট ভ্রান্তিতে ভরপুর ছিল।

এতদসত্ত্বেও খৃস্টানদের উপর আবশ্যক করা হয়েছিল এসব কুসংস্কারের উপর বিনা-প্রশ্নে ঈমান আনয়ন করা, যেমন খৃস্টানদের দর্শন হচ্ছে (আগে ঈমান আন পরে চিন্তা কর), এটা ছিল তাদের আকিদার ক্ষেত্রে।

ইবাদতের ক্ষেত্রে খৃস্টানরা ইউরোপ ও অন্যদের উপর বৈরাগ্যপনা আবশ্যক করে দিয়েছিল, যা মনুষ্য সুস্থ প্রকৃতি বিপরীত আচরণ, তাই বিনা সন্দেহে সুস্থ চিন্তার দাবি ছিল এ দীন ত্যাগ করা, কিন্তু তার বিপরীতে নাস্তিকতা গ্রহণ করা সমাধান ছিল না, বরং সঠিক দীন তথা ইসলাম গ্রহণ করাই তার সমাধান ছিল।

২. গির্জার[1] লোকদের বাড়াবাড়ি: গির্জার লোকেরা সাধারণ খ্রীস্টানদের জন্য নিজেদের রব বানিয়ে রেখে ছিল, যা ইচ্ছা তাই তাদের জন্য রচনা করত এবং আরোপ করত তাদের উপর নানা ধরনের টেক্স বা কর। তারা আল্লাহ ও বান্দার মাঝে প্রতিনিধিত্ব করার বাহানায় সাধারণ মানুষের ঈমান ও বিবেকের উপর কর্তৃত্ব করত। তাদের সামনে ভুল স্বীকার করা ও ক্ষমা প্রার্থনা করার রীতি ইত্যাদি খ্রীষ্টানদের উপর আবশ্যক করেছিল, যা ইউরোপ ইতিহাসে সংরক্ষিত রয়েছে এখনো।

---

[1] গীর্জার লোক দ্বারা উদ্দেশ্য ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব অথবা পার্লামেন্টের সদস্যবৃন্দ।

৩. বৈজ্ঞানিক বিকাশ: বিজ্ঞান কখনো দীনের বিপরীত নয়, তবে সত্য সর্বদা কুসংস্কারের শত্রু। যেহেতু খ্রীস্টান ধর্ম কুসংস্কার দ্বারা পূর্ণ ছিল, তাই বিজ্ঞান সাধারণভাবে তার বিদ্রোহী হয়ে উঠে।

ইউরোপে যখন থেকে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও গবেষণার দ্বার উন্মোচন হয়, তখন জ্যোতির্বিজ্ঞান ও পরিবেশবিদদের সাথে গির্জার লোকদের বড় যুদ্ধ বাঁধে। তারাও ব্যাপক যুদ্ধের ঘোষণা করে দু'টি কারণে:

ক. বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি মুসলিমদের থেকে গৃহীত।

খ. তাদের তথাকথিত মুকাদ্দাস কিতাবে তারা পৃথিবী ও ইতিহাস সংক্রান্ত যেসব কুসংস্কার দাখিল করেছে বিজ্ঞান তার সমর্থন করে না।

তাই বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকরা বিভিন্ন নির্যাতনের শিকার হয়, তাদের কাউকে আগুনে পর্যন্ত পোড়ানো হয়।

যুগ যত অগ্রসর হয় বৈজ্ঞানিক সত্যতা স্পষ্ট ও গির্জার ভ্রান্তি প্রকাশ পায়, এ সুবাদে কতক বিজ্ঞান প্রেমিক অন্যায়ভাবে সকল ধর্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে, এ থেকে তারা আল্লাহর চিরস্থায়ী পরিপূর্ণ দীন ইসলামকেও ছাড় দেয় নি।

তারা মানুষের নিকট প্রচার করে, যে সত্য আবিষ্কার হয় তা নাস্তিকতার পক্ষে ও দীনের বিপক্ষে নতুন প্রমাণ।

৪. ইয়াহূদী: ইয়াহূদী ও খৃস্টানদের মধ্যকার যুদ্ধ অত্যন্ত ধ্বংসাত্মক, গির্জাগুলো তাদের শাসনামলে ইয়াহূদীদের কোণঠাসা করে রেখেছিল তাদের ফ্যাসাদ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির কারণে। অতঃপর যখন গির্জার বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু হয়, ইয়াহূদীরা তাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করার সুযোগ পায়, তাই তারা খৃস্টানদের দুশমন নাস্তিকদের পক্ষ নেয়। এ ছিল এক বিবেচনায়, দ্বিতীয় বিবেচনায় ইয়াহূদীরা সকল দীন বিলুপ্ত ও আন্তর্জাতিক সরকারগুলো ধ্বংস করে দাউদি রাজত্ব কায়েম করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এ জন্য যারা ইয়াহূদী নয় তাদের বিভ্রান্ত এবং তাদের দীন ও আখলাক বিনষ্ট করা তাদের দায়িত্বে পরিণত হয়, আরো জরুরি হয় তাদের মাঝে ভাঙ্গন ও নাস্তিকতা ছড়িয়ে দেওয়ার।

এ জন্য দেখা যায় নাস্তিকপূর্ণ অধিকাংশ মতবাদের নেতৃত্বে রয়েছে ইয়াহূদী, অধিকন্তু তারা সম্পদ ও প্রোপাগান্ডা দ্বারা সমগ্র বিশ্বে নাস্তিকতা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা চালায়।

নাস্তিকতার অনেক মতবাদ ও চিন্তাধারা রয়েছে, তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে: প্রাচ্যে সমাজতন্ত্র, পাশ্চাত্যে উজুদিয়াহ (existentialism)[1]।

---

[1] দিনেমার দার্শনিক কিকেগার্ড (১৮১৩-৫৫) থেকে উদ্ভূত এবং ফরাসী দার্শনিক ও সাহিত্যিক সার্ত্রে (১৯০৫-৮০) কর্তৃক প্রচারিত এই মতবাদ যে, নির্লিপ্ত ও প্রতিকুল বিশ্বে মানুষ একক অনন্য নিঃসঙ্গ প্রাণী, যে নিজ কর্মের জন্য দায়ী এবং নিজ নিয়তি নির্ধারণের ব্যাপারে স্বাধীন। তাদেরকে অস্তিত্ববাদীও বলা হয়।

এ ছাড়া আমেরিকা ও ইউরোপে অনেক লোক আছে, যারা নির্দিষ্ট কোনো ধর্ম অনুসরণ করে না। তারা ছোট-বড় বিষয়ে ধর্ম নিয়ে চিন্তা করে না, যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন:

﴿بَلِ ٱدَّٰرَكَ عِلۡمُهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِۚ بَلۡ هُمۡ فِي شَكّٖ مِّنۡهَاۖ بَلۡ هُم مِّنۡهَا عَمُونَ ٦٦﴾ [النحل: ٦٦]

“বরং আখেরাত সম্পর্কে তাদের জ্ঞান নিঃশেষ হয়ে গেছে, বস্তুত তারা সে সম্পর্কে সন্দেহের মধ্যে রয়েছে, কার্যত তারা এ বিষয়ে অন্ধ”।[1]

[সম্পাদক]

[1] সূরা নামল: (৬৬)

কমিউনিজম (সাম্যবাদ)

কমিউনিজম হচ্ছে নাস্তিকতাপূর্ণ এক মতবাদ, যার প্রতিষ্ঠাতা কার্ল মার্কস ও তার সাহায্যকারী ফ্রেডারিক এঞ্জেল। এ মতবাদের মূলনীতি হচ্ছে আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার করা, সকল নবীদের মিথ্যারোপ করা ও সকল দীনের সাথে কুফরি করা।

কমিউনিজম বিকাশ ও তার বিস্তারের কারণ:

১. গির্জার কুসংস্কারের বিপক্ষে আধুনিক বিজ্ঞান জয়ী হলে নাস্তিকতার বিস্তার লাভ করা।

২. শিল্প বিপ্লব পরবর্তী শ্রমজীবী মানুষের উপর অত্যাচারের খড়ক নেমে আসা।

৩. ইয়াহূদী পরিকল্পনার ফসল কমিউনিজমের প্রতিষ্ঠাতা (মার্কস) ছিল একজন ইয়াহূদী। কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের অধিকাংশ শাসক ও বিশ্বে কমিউনিজম রাজনৈতিক দলের অনেক নেতা ছিল ইয়াহূদী।

অনুরূপ যে সমাজে ভাঙ্গন সৃষ্টি হয় ও যেখানে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ বেড়ে যায়, সে সমাজকে কমিউনিস্টরা তাদের উর্বর ভূমি জ্ঞান করে। এভাবে কমিউনিষ্ট মতবাদ বিস্তার লাভ করে।

যেসব নীতি দ্বারা কমিউনিষ্ট মতবাদ পরিপুষ্ট হয়:

১. তর্কদর্শন:

তর্কদর্শন মূলত জার্মানি রূপকথামূলক (কাল্পনিক) এক দর্শন, তার শ্লোগান: প্রত্যেক বস্তু নিজের সাথে তার বিপরীত বস্তু বহন করে, সকল বিপরীত বস্তু থেকে তৃতীয় শক্তি জন্ম লাভ করে, এ তৃতীয় শক্তি আবার বিপরীত শক্তি ধারণ করে, এভাবে চলতে থাকে। কার্ল-মার্কস এ থিউরিকে বাস্তবে রূপায়িত করেন, যেমন তিনি নির্ধারণ করেন:

পুঁজিবাদ (একটি শক্তি) সে তার সাথে বিপরীত বস্তু: (শ্রমজীবী মানুষ)কে ধারণ করে। পুঁজিবাদ ও শ্রমজীবী উভয়ের মধ্যকার দ্বন্দ্ব থেকে তৃতীয় শক্তি: সাম্যবাদ বা কমিউনিজম জন্ম হয়।

২. সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা:

ইউরোপে সংস্কারমূলক বিভিন্ন মতবাদের জন্ম হয়, যার নামকরণ করা হয় সমাজতান্ত্রিক। এগুলো মূলত কৃষক ও শ্রমজীবী মানুষের উপর জুলম ও অত্যাচারের প্রতিবাদে আত্মপ্রকাশকারী মতবাদ।

মার্কস তার নেতৃত্বের আসনে বসে এবং এসব চিন্তাধারা থেকে উপকৃত হয়, কিন্তু সে তার চিন্তাকে দু'টি স্বতন্ত্র ভিন্নমাত্রা প্রদান করে:

ক. মার্কসের সমাজতন্ত্র নাস্তিকতায় পূর্ণ, কোনো দীন ও প্রচলিত আখলাকে বিশ্বাস করে না।

খ. মার্কসের ধারণা মতে, তার সমাজতন্ত্র প্রকৃত সমাজতন্ত্র, অন্যান্য চিন্তাধারার বিপরীত তার মতবাদই বৈজ্ঞানিক নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত,

অন্যান্য মতবাদ শুধু কল্পনাপ্রসূত সংস্কারমূলক শ্লোগান। তাই মার্কস তার কমিউনিজম বা সাম্যবাদকে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র নামকরণ করে।

৩. ডারউইনের থিউরি:

ডারইউনির থিউরি বস্তুত কল্পনামাত্র, কোনো মতবাদ হওয়ার যোগ্যতা তার মাঝে নেই, বাস্তব হবে দূরে থাক। এ কল্পনাপ্রসূত মতবাদ মনে করে, জীবন একটি মৌচাক থেকে উত্তরোত্তর কয়েকটি বাস্তব বা অবাস্তব স্তর পার করে মানুষ পর্যন্ত উন্নত হয়। এ উন্নতি হয় সৃষ্টিকারী শক্তি অর্থাৎ স্রষ্টা ব্যতীত। মার্কস ও এঞ্জেল (ডারউইনের এমন) দু'টি নীতি ব্যবহার করে, যার উপর সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়, তা হচ্ছে:

ক. মানুষের পশুত্ব ও তার বস্তুজগৎ।

খ. বল প্রয়োগ।

ডারউইনের কাল্পনিক মতবাদ যেরূপ ধরে নেয় যে, জীবন অবশ্যম্ভাবী, জীবিতদের তাতে কোনো হাত নেই। সেভাবেই কমিউনিজম বা সাম্যবাদ ধরে নেয় যে, ঐতিহাসিক দ্বন্দ্ববাদ (অর্থাৎ এক স্তর থেকে অপর স্তরে স্থানান্তরিত হওয়া, যার বর্ণনা সামনে আসছে) অবশ্যম্ভাবী, তাতে মানুষের কোনো হাত নেই।

কমিউনিজম বা সাম্যবাদের গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি:

১. কোনো ইলাহ নেই, জীবন হচ্ছে বস্তু: :

এ কথার সারবস্তু আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার করা, সকল রাসূলদের মিথ্যারোপ করা, ধর্মীয় সকল আকিদা ও তার নির্দেশিত আচরণকে অস্বীকার করা এবং মানুষের জীবনকে সমাজতান্ত্রিক জীবন ও জড়পদার্থের জীবন ধারার অনুগত করা।

২. ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা প্রদান করা:

মানুষকে জন্তু হিসেবে গ্রহণ করে তার উপর ভিত্তি করে কমিউনিজম বিশ্বাস করে যে, একমাত্র পানাহারের তাগিদ মানুষকে প্রত্যেক কাজ ও চিন্তার জন্য উদ্বুদ্ধ করে, মানুষের ধর্ম ও চরিত্র তাদের অর্থনৈতিক উন্নতির অন্তরায়। কমিউনিজম মানুষের ইতিহাসকে অবশ্যম্ভাবী পাঁচটি ভাগে ভাগ করে:

ক. প্রাথমিক কমিউনিজম স্তর।

খ. দাসত্বের স্তর।

গ. জমিদারিত্বের স্তর।

ঘ. পুঁজিবাদের স্তর।

ঙ. মার্কসি কমিউনিজম বা মার্কসি সাম্যবাদের স্তর। তাদের ধারণা এ মতবাদ নিশ্চিতভাবে আগামী বিশ্বকে নেতৃত্ব দিবে।

৩. বাস্তবতা মতবাদকে জন্ম দেয়, তার বিপরীত নয়:

বাস্তবতা মতবাদকে জন্ম দেয়, মতবাদ বাস্তবতাকে জন্ম দেয় না। অর্থাৎ এ পাঁচটি স্তর মানুষের মাঝে কিছু বিশ্বাস ও চিন্তার জন্ম দেয়, যা মূলত তার অর্থনৈতিক অবস্থা ও তার জীবন স্তরের বিপরীত দিক

বা বিশ্বাস ও চিন্তা, ভিন্ন কিছু নয়। এটা—তার ধারণা মোতাবেক—অবশ্যম্ভাবী, এর থেকে পলায়ন করার কোনো পথ নেই এবং এতে কোনো দ্বিদমত নেই।

উদাহরণত: জমিদারি স্তর, এ স্তরের জন্য দীন ও আখলাক অবশ্যম্ভাবী, যেমন দীনের প্রতি ঈমান আনা, সম্মান সংরক্ষণ ও পরিবারিক পদ্ধতি সুসংহত করা তার দাবি। যখন মানব জাতি অবশ্যম্ভাবীভাবে পুঁজিবাদে প্রত্যাবর্তন করে, তখন তার জন্য নাস্তিক হওয়া অবশ্যম্ভাবী হয়, এতে নারীরা শ্রমজীবী হবে এবং পরিবারিক কোনো বন্ধন থাকবে না। এ স্তরে সম্মানকে ধুলোয় মিশানো সঠিক আচরণ বিবেচিত হয়।

এ মিশন বাস্তবায়ন করার নিমিত্তে কমিউনিজম বা সাম্যবাদ সিদ্ধান্ত নেয় যে, কোনো কৃষক সমাজ ধর্মহীন পাওয়া অসম্ভব, আবার ধর্মযুক্ত শিল্প সমাজ পাওয়াও অসম্ভব।

সুতরাং মানব জাতি যখন পরিপূর্ণরূপে কমিউনিজম বা সাম্যবাদে প্রত্যাবর্তন করবে—সাম্যবাদীদের নিকট এ স্তরে প্রত্যাবর্তন করা অবশ্যম্ভাবী—তখন রাষ্ট্রের অস্তিত্ব, ব্যক্তি মালিকানা, পরিবার ও দীন সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হবে।

মার্কস এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, কিন্তু বাস্তবতা তার সিদ্ধান্তকে প্রত্যাখ্যান করেছে সম্পূর্ণরূপে, কারণ সাম্যবাদ বিপ্লব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে চীন ও রাশিয়ায়, এ দু'টি দেশ কৃষি প্রধান, কখনো

পুঁজিবাদের স্তর পার করে নি। আর ব্রিটেন, যার সম্পর্কে মার্কস ভবিষ্যৎবাণী করেছিল যে, এটা সর্বপ্রথম কমিউনিস্ট বা সাম্যবাদী রাষ্ট্রে পরিণত হবে, কারণ তাতে পুঁজিবাদ পূর্ণতা পেয়েছে, বর্তমান পর্যন্ত তা পুঁজিবাদ রাষ্ট্ররূপেই আছে।

এটা এক বাস্তবতা, ইউরোপ ব্যতীত অন্যান্য দেশের ক্ষেত্রেও তার এ সিদ্ধান্ত সঠিক ও তার অবশ্যম্ভাবী বলে বেড়ানো কাজগুলো সত্য প্রমাণ হয় নি। উদাহরণত, শিল্প বিপ্লবের দিক থেকে জাপান ইউরোপের পুঁজিবাদী ও সাম্যবাদী অনেক দেশকে ছাড়িয়ে গেছে, তা সত্যেও সে স্বীয় দীন, প্রথা ও আচরণকে প্রাচ্যের কৃষি প্রধান অনেক দেশের তুলনায় অধিক আঁকড়ে আছে, শিল্প প্রধান দেশের তুলনায় তো আছেই।

আলবেনিয়া ইউরোপের অন্যান্য দেশের তুলনায় বেশি পশ্চাৎ মুখী, অথচ সে বর্তমান শাসনের পূর্বে সবচেয়ে বেশি মার্কসি পোশাক পরিধান করে ছিল।

ইসলামি বিশ্বে ইসলামি জাগরণের সূচনাই প্রমাণ করে ইসলামকে আঁকড়ে ধরে শিল্পন্নীতির চূড়ায় পৌঁছা সম্ভব। শিল্পনীতি বা অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন মুসলিম উম্মাহর কর্তব্য, কারণ তার দীনই তাকে এরূপ নির্দেশ প্রদান করে।

অস্তিত্ববাদ

অস্তিত্ববাদ যাতনা ও ধ্বংসের এক আলামত, আল্লাহর অবাধ্য ইউরোপ সমাজ যাতে ভুগছে। পাশ্চাত্য বিশ্বে নাস্তিকতার দর্শন হিসেবে তার খ্যাতি সবচেয়ে বেশি, যদিও তাতে তুলনামূলক অনেক অগ্রগতি বিদ্যমান, যা বাস্তবায়ন করেছে ধ্বংসাত্মক নতুন দর্শন, যার নাম গঠনবাদ অথবা কাঠামোবাদ।

অস্তিত্ববাদ নাম কেন হল?

অস্তিত্ববাদ শব্দটি অস্তিত্ব ধাতু থেকে সৃষ্ট, কারণ তার দর্শনের সারাংশ হচ্ছে: "অস্তিত্ব সারাংশ বা উপাদানের আগে", তার দাবি ও বিষয় হচ্ছে: মানুষের জন্মের পূর্ব থেকে নির্ধারিত এক স্রষ্টা বা মতবাদ পালন করার জন্য মানুষের অস্তিত্ব বা সৃষ্টি হয় না, বরং তার অস্তিত্বই এমন মতবাদকে নির্ধারণ করে যার উপর ভবিষ্যতে সে চলবে এবং যা সে গ্রহণ করবে, প্রত্যেক ব্যক্তি গ্রহণ ও মনোনয়ন করার ক্ষেত্রে স্বাধীন।

অতএব অস্তিত্ববাদ প্রত্যেক দীন, মূল্যবোধ ও সংস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার নামান্তর, যেমন:

১. খ্রীস্টবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ:

অস্তিত্ববাদ খ্রীস্টবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, কারণ খৃস্টবাদ মানুষের জন্য আগাম নীতি ও আদর্শ নির্ধারণ করে, যেমন খ্রীস্টীয় আকিদায়

বিশ্বাসী হওয়া, ধর্মীয় ব্যক্তিদের অনুসরণ করা এবং তার ইচ্ছা ও বিবেক সমর্থন করে না তার প্রতিও ঈমান, কেবল আনা ধর্মে আছে তাই তাকে তা মানতে হবে।

২. সামাজিক সংগঠনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ:

অস্তিত্ববাদ সামাজিক সংগঠনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। কারণ, সামাজিক সংগঠন জামা'আত বা একতাবদ্ধ জীবনকে গুরুত্ব দেয়, ব্যক্তির গুরুত্ব খর্ব করে এবং সকল মানুষকে—তাদের বিভিন্ন স্বভাব সত্ত্বেও—এক আদর্শের উপর একত্র করে, যা পূর্ব থেকে নির্মিত, কমিউনিজম বা সাম্যবাদ তার এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

৩. মানসিক মতবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ:

অস্তিত্ববাদ মানসিক মতবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। কারণ, অস্তিত্ববাদের দৃষ্টিতে মানসিক মতবাদ মানুষের হাকিকত সম্পর্কে গাফিল, অর্থাৎ (গোপন অহং), অধিকন্তু সমাজ সংগঠন ও সাধারণ নীতি নির্ধারণ করে বিবেক, যা অস্তিত্ববাদীরা প্রত্যাখ্যান করে সম্পূর্ণভাবে। এ জন্য অস্তিত্ববাদীদের লেখনী অধিকাংশ ক্ষেত্রে আবেগময় ও আপেক্ষিক হয়, চিন্তাগত দর্শন হয় না।

অস্তিত্ববাদের প্রকার:

অস্তিত্ববাদ দু'প্রকার:

১. সূফী অস্তিত্ববাদী: তাদেরকে বিশ্বাসী অস্তিত্ববাদী বলা হয়, এ মতের প্রসিদ্ধ ধারক হচ্ছে, কার্ল য়াসবারজ (যাবরাজ), মৃত ১৯৬৯ই.

২. স্বেচ্ছাচারী অস্তিত্ববাদী: তাদেরকে নাস্তিক অস্তিত্ববাদী বলা হয়, অস্তিত্ববাদী দ্বারা সাধারণত তাদেরকে বুঝানো হয়।

সূফী অস্তিত্ববাদীর উদাহরণ হচ্ছে কঠোর পরিশ্রম। বাস্তব বর্জিত হওয়ার কারণে তারা এক দিকে খ্রীস্টীয় আকিদার উপর বিশ্বাস হারায়, অপর দিকে স্বভাবের টানে ঈমানের প্রয়োজনীয়তা বোধ করে। গ্রহণ ও প্রত্যাখ্যান করার মধ্য থেকে সূফী অস্তিত্ববাদ জন্ম লাভ করে, তবে সঠিক ঈমানের হিদায়েত তারা পায়নি। এ মতের ধারকরা আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার করে না, তবে তারা গির্জার প্রভূতে পরিতৃপ্ত নয়, ফলে হিন্দু সূফী ও অন্যদের সাধনায় তারা ঘুর-পাক খায়।

স্বেচ্ছাচারী অস্তিত্ববাদের প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছে জার্মানি ইয়াহূদী দার্শনিক (নিতশাহ), মৃত ১৯০০ই.। ইয়াহূদী সম্পর্কের কারণে স্বভাবত সে খ্রীস্টবাদের শত্রু ছিল। নিতশাহ স্পর্ধা দেখিয়ে বলে (রব মারা গেছেন), তার স্থলে মহান মানব (সুবরমান) স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন, যার প্রতিনিধিত্ব করছে দেশ ও সমাজের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ, সকল মানুষের কর্তব্য তাদের আনুগত্য করা।

সে আরো বলে, খ্রীস্টবাদ হচ্ছে বেড়ি ও জেলখানা, মানুষের মনুষ্যত্ব ও স্বাধীনতা বিধ্বংসী, সে মানুষকে গির্জার কতক ব্যক্তির দাসে পরিণত করে।

বিংশ শতাব্দীর স্বেচ্ছাচারী অস্তিত্ববাদের প্রধান ব্যক্তি (সারতার) ১৯৮০ই. মারা যান। তিনি ফ্রান্সী ইয়াহূদী ছিল, প্রথম সে সমাজতান্ত্রিক আদর্শে বড় হয়, পরবর্তীতে সে তার পূর্বপুরুষ (নিতশার) মতবাদ অস্তিত্ববাদকে জীবিত করে, কিন্তু তিনি বিবেক ও দর্শনকে ব্যবহার করেননি, তবে ব্যবহার করেছেন আদব ও সাহিত্যকে, যেমন আবেগময়তা, ধৈর্যশীলতা ও রূপকথা। এভাবে ব্যাপক প্রসারতা লাভ করে তার চিন্তাধারা। সে দার্শনিকদের সমালোচনা থেকে সুরক্ষার জন্য দর্শনের ময়দানকে এড়িয়ে চলে, দ্বিতীয়ত দার্শনিকদের সামনে তার টিকে থাকার ক্ষমতাও ছিল না।

ইসলামি বিশ্বে অস্তিত্ববাদীদের ঝুঁকি:

ইসলামি বিশ্বে অস্তিত্ববাদ বিস্তার লাভ করার ফলে পাশ্চাত্য সভ্যতায় বিশ্বাসী কতক যুবক তা সহজে গ্রহণ করে। মুসলিম সমাজে কাফেরদের মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধের উপকরণের সয়লাব, ইসলামি শিক্ষা ও সচেতনতার দুর্বলতা, যুবকদের সীমালঙ্ঘন, প্রসিদ্ধির মোহ ও বিরোধিতার মনোভাব অস্তিত্ববাদের ময়দানকে প্রস্তুত করে দেয়।

অস্তিত্ববাদীরা এমন ছিদ্র দিয়ে ইসলামি বিশ্বে প্রবেশ করে, যা অনেক মানুষ বুঝে না, যেমন সাহিত্য: (বর্ণনা, কবিতা, নাটক, সমালোচনা)। এ তথ্য আমাদের নিকট স্পষ্ট করে যে, কমিউনিজম বা সাম্যবাদ ও অন্যান্য মতবাদের ধারকরা লেখনী সাহিত্যের দিকে ঝুঁকে যায় এ জন্যই।

বস্তুত কমিউনিস্ট বা সাম্যবাদীরা তাদের মতবাদ থেকে পিছু হটেনি, বরং (সারতার) জীবনের শেষে সাম্যবাদ (কমিউনিজম) ও তার মাঝে যেভাবে সমন্বয় করেছিল, তারা সেটার অনুসরণ করে। তারা দেখল সমাজতন্ত্রের বিপ্লবী শ্লোগান ম্লান হয়ে গেছে, দ্বিতীয়ত ইসলামি সমাজ কখনো স্পষ্ট নাস্তিকতা গ্রহণ করবে না, তাই তারা সাহিত্য কর্মকে আড়াল হিসেবে গ্রহণ করে।

অনুরূপ 'সারতার' নাস্তিকতাপূর্ণ নতুন দর্শন সৃষ্টির উদ্দেশ্যে মার্কস, অস্তিত্ববাদ ও অন্যান্য মাযহাবের নির্যাস গ্রহণ করে, যার নামকরণ করা হয় গঠনমূলক মতবাদ অথবা কাঠামোগত মতবাদ। উভয়ের নেতৃত্ব দেয় (ক্লোদ লিফি শাতরাবিস), এটাও মৌলিকত্ব ও হাকিকতের বিবেচনায় অস্তিত্ববাদ থেকে পৃথক কিছু নয়, তবে তার দাবি এ মতবাদ অস্তিত্ববাদ থেকে আরো ব্যাপক ও বিশ্লেষণাত্মক। তার অনুসারীরা দাবি করে (এটাই ভবিষ্যতের দর্শন), অতিশীঘ্র এ নীতি সকল আদর্শ ও বিধানকে বিলুপ্ত করবে এবং তার জায়গায় নতুন নীতি, আদর্শ ও বিধান চালু করবে, অর্থাৎ জগত, মানুষ ও ধর্মের জন্য নতুন দর্শন প্রবর্তন করবে, তাই পাশ্চাত্যে তাকে 'আধুনিকত্ব' বলা হয়, কখনো তার অনুবাদ করা হয় (নতুনত্ব)। তাদের এ পরিভাষা প্রতারণামূলক, এর অভ্যন্তরীণ বিষয় না জেনে অনেকে এর জালে আটকা পড়েছে।

তারা যে বাণীর দিকে আহ্বান করে সেটা শুধু ভাষা ও সাহিত্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়—তাতে ধ্বংস ও বিপদ যা থাকার তা তো আছেই—তবে প্রকৃত অর্থে সেটা হচ্ছে জীবন, আচরণ, ধর্ম ও প্রত্যেক বস্তুর জন্য এক দর্শন ও দৃষ্টিভঙ্গি, এবং সকল আদর্শ, পরিবেশ ও মতামতকে পরিবর্তনকারী, বাহ্যিক অথবা আভ্যন্তরীণ প্রত্যেক কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ।

অস্তিত্ববাদ ও তার আকিদা ধারণকারী ব্যক্তিদের প্রতি সামান্য দৃষ্টি দিলেই তার পশ্চাতে থাকা সূক্ষ্ম পরিকল্পনা ও গোপন ষড়যন্ত্র স্পষ্ট হয়ে যাবে। আরও বুঝা যাবে যে, এর পিছনে তাদের একটি গোপন উদ্দেশ্য রয়েছে। তাদের প্রসিদ্ধ ব্যক্তিবর্গ নিম্নরূপ:

এডোনিস: নুসাইরি (মতবাদ বিশ্বাসী)।

বদর শাকির আসসাইয়াব: সে ছিল কমিউনিস্ট (সাম্যবাদী) , পরবর্তীতে সবকিছুতে অবিশ্বাসী হয়ে হতাশার জীবন যাপন করে। সামীহুল কাসিম: দ্রুয মতবাদে বিশ্বাসী, আবার কমিউনিস্টও। নাযার ক্বাব্বানী: স্বেচ্ছাচারী অস্তিত্ববাদী।

আব্দুল ওয়াহহাব আল-বায়াতি: কমিউনিস্ট (তথাকথিত সাম্যবাদী)। আরেকটি বিষয়ের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা জরুরি যে, এদের মতবাদে বিশ্বাসী সব জায়গার লোকদের মধ্যে এক ধরনের আঁতাত পরিলক্ষিত হয়। ইসলামি বিশ্বে সমকালীন সাহিত্যের উপর বিশ্লেষণকারী তা অতি সহজেই দেখতে পাবে।

অধ্যয়নের জন্য মূল পাঠ:

এডোনিস[1] বলেন:

কবিতা অথবা নাটক অথবা ঘটনা আরব জনগণ যার মুখাপেক্ষী, এমন বস্তু নয় যা তাকে তৃপ্ত করবে কিংবা তার সামনে ধ্বংসাত্মক বস্তু পেশ করবে, এমন বস্তুও নয় যা তাকে চলমান জীবনে নেতৃত্ব দিবে, তবে তা এ জীবনকে আটকে দিবে, অর্থাৎ তার অবস্থান থেকে তাকে বের করবে, তার পৈতৃক আদর্শ সম্পর্কে তাকে ভাবিয়ে তুলবে এবং তার নফসের বাইরে তাকে নিক্ষেপ করবে। নিশ্চয় এটা প্রতিরোধ করবে তার রাজনীতি, তার ধর্মীয় সংস্থা, তার পারিবারিক সংস্থা, তার পৈতৃক রীতি, তার সংস্থা ও তার সামাজিক ভিত্তি, তার সকল নিদর্শন ও তার প্রতিষ্ঠানসহ। আর এটা করা হবে তাকে সর্বতোভাবে ধ্বংস করার নিমিত্তে, অর্থাৎ নতুন আরব মানব তৈরি করার লক্ষ্যে।

এভাবেই বিপ্লব ঘটাতে হবে আমাদের: নাটকের পরিবর্তে নাটক, কবিতার পরিবর্তে কবিতা, ঘটনার পরিবর্তে ঘটনা। আমাদের কাজ ঐতিহ্য ধ্বংস করা, কারণ এখানেই তো বিপ্লবের প্রথম শত্রু আত্মগোপন করে আছে।

সমাপ্ত

---

[1] তার প্রকৃত নাম আলি আহমদ সায়িদ, সে তার নিজের নাম রেখেছে এডোনিস। এটা মূলত ফিনিকিয়াদের এক উপাস্যের নাম।